দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

নহে
এ কর্ম
শ্লাঘনীয়
পৃ: ১১

পুরস্কার
ফেরত একটি
ষড়যন্ত্র
পৃ: ১৪

৬৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ১৬ নভেম্বর ২০১৫।। ২৯ কার্তিক - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

## পুরস্কার ফেরত কি একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র?

★ যাঁরা পদক ফেরত দিলেন তাঁদের একাংশ গত লোকসভা নির্বাচনে মোদি তথা বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন

★ কাল্পনিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এভাবে পদক ফিরিয়ে নিজেরাই কি অসহিষ্ণুতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না? ১

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২৯ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৬ নভেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** ▯ ৬-৮

**খোলা চিঠি : মধুচন্দ্রিমার অভিনন্দন রইল** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

**হালকা চালে অরাজনৈতিক মন্তব্য বিজেপিকে বিপাকে ফেলেছে বিহারে** ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

**নহে এ কর্ম শ্লাঘনীয়** ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১১

**পুরস্কার ফেরত একটি ষড়যন্ত্র** ▯ রমানাথ রায় ▯ ১৪

**উদারবাদীদের আসল রূপ** ▯ চেতন ভগত ▯ ১৭

**প্রসঙ্গ জগদ্ধাত্রী পুজো** ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

**জগদ্ধাত্রী পূজা ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র** ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ২৩

**কতিপয় বুদ্ধিজীবী ভারতের সম্মান নষ্ট করছেন** ▯ অবধেশ কুমার ▯ ২৭

**জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ভারসাম্যহীনতার বিপদ নিয়ে আর এস এসের উদ্বেগ** ▯ ২৯

**সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের মতলব আজ পরীক্ষার মুখে** ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩০

**সংখ্যালঘুরা কি নিজেদের ভারতীয় মনে করে?** ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ৩২

**সাক্ষাৎকার : অসহিষ্ণুতা বাড়ছে না, এনিয়ে ভণ্ডামি করার কিছু নেই** ▯ বিবেক দেব রায় ▯ ৩২৩৯

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৪** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**

# স্বস্তিকা

## সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ভারত-নেপাল সম্পর্ক

নেপালের নতুন সংবিধানে মধেসিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে, তা নিয়ে ভারত উভয় সঙ্কটে পড়েছে। এটা নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও চীন ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নেপাল-ভারত সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন অম্লানকুসুম ঘোষ ও অর্ণব নাগ।

**দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।**


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

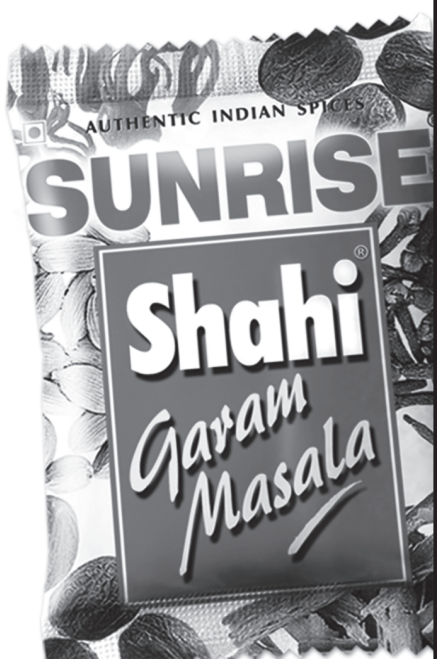


SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

# সম্পাদকীয়

## কাশ্মীরের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর তিন মন্ত্র

অটল মন্ত্রে কাশ্মীরকে লইয়া চলিবার সঙ্কল্প করিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কাশ্মীরে যাইয়া উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন—জামুরিয়ত (গণতন্ত্র), কাশ্মীরিয়ত (কাশ্মীরের উদ্দীপনা) ও ইনসানিয়ত (মানবতা)। এই তিনটি মন্ত্র এগিয়ে চলিবার পথে সহায়ক হইবে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, কাশ্মীর লইয়া তিনি কাহারও কাছ হইতে পরামর্শ শুনিবেন না। পাকিস্তানের প্রচেষ্টায় প্রায়শই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীর লইয়া নাক গলাইবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস করিয়া থাকে, প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেইদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কাশ্মীরের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী ৮০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজও ঘোষণা করিয়াছেন। জম্মু ও কাশ্মীরকে আধুনিক, উন্নয়নশীল ও অগ্রসর রাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই অর্থ সহায়ক হইবে। এই প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের কথা বলিয়াছেন তিনি। জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ আজ কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে বাদবাকি দুনিয়া হইতে। সামান্য সাধারণ বিষয়ও সমগ্র উপত্যকাকে অশান্ত করিয়া রাখিয়া থাকে দিনের পর দিন। ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে। কাশ্মীরের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নিজের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাক-প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া দেশের বিদেশ নীতিতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বিভ্রান্তিকর। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করিতে রাজি নয়, কারণ তাহাদের দেশের মূল নীতিই হইল ভারত বিরোধিতা। সেই দেশের নির্বাচিত সরকারের চাইতেও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বেশি, আবার সেই সেনাবাহিনীও জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সন্ত্রাসবাদীরা চাহিতেছে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করিতে। কাজেই শত আলোচনা চলিলেও দুই দেশের সম্পর্ক কোনোকালেই স্বাভাবিক হইবে না। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর সফরে গিয়া সেখানকার উন্নয়নে যে পদক্ষেপ লইয়াছেন তাহা যথাযথ। মনে রাখিতে হইবে, কাশ্মীরের আজ যথার্থই উন্নয়নের প্রয়োজন। কাশ্মীরে শিল্পস্থাপন হইলে বেকার যুবকদের চাকরির যথার্থ সুযোগ মিলিলে সন্ত্রাসবাদ কমিতে বাধ্য। রাজ্যের মানুষ স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিলে রাজ্যের উন্নয়নের অগ্রগতি হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ইনসানিয়ত' অর্থাৎ মানবতার কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। সমগ্র কাশ্মীরের জন্য এই বিষয়টি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সন্ত্রাসবাদীরা যেমন কাশ্মীরের মানুষের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক একইভাবে জঙ্গি দমনের নামে প্রশাসন তাহাদের কোণঠাসা করিতেছে। রাজ্যে পিডিপি-র সঙ্গে বিজেপি জোট বাঁধিবার ফলে এই সমস্যা কিছু কমিয়াছে। কারণ মুফতি মহম্মদ সঈদের পিডিপি বরাবরই গোঁড়া কাশ্মীরি দল। গত বছর বন্যায় কাশ্মীরের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। তাই কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রধানমন্ত্রী যে প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে উন্নয়ন হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ইহার পূর্বেও বহু টাকা কাশ্মীরের জন্য খরচ করা হইয়াছিল কিন্তু উন্নয়ন হয় নাই, পরিকাঠামো-সহ যুবকদের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। উন্নয়নের অর্থ যাহাতে জঙ্গিদের হাতে না পৌঁছায় তাহা দেখিতে হইবে এবং এই অর্থ যাহাতে কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্যই ব্যবহৃত হয় তাহাও সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

## সুভাষিতম্

*উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তমনে তথা।*
*সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা।।*

*সূর্য উদয় ও অস্ত দুই সময়েই রক্তিম থাকে। তেমনি যাঁরা মহৎ তাঁদের আচরণ ঐশ্বর্যে এবং সঙ্কটে একই রূপ থাকে।*

# বাংলাদেশে পুজোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হিন্দুদের উপর হামলার সংখ্যাও

**বিশেষ প্রতিনিধি।।** কেমন আছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা? জাঁকজমকে শারদীয় দুর্গাপুজো গেল, হিসেবের খাতায় পুজো অনেক। গত বছরের চেয়ে পুজো বেড়েছে। এবার পুজো হয়েছে ২৯ হাজার ৭৪, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার ৩৮৭। খোদ রাজধানীতে পুজো বেড়েছে তিনটি। এবার পুজো হয়েছে ২২৫, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২২২। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো মণ্ডপে গেছেন, রাষ্ট্রপতি পুজো উপলক্ষে বঙ্গভবনে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। তবে পুজোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হামলার সংখ্যাও। সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, প্রতিমা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অগুণতি। হামলা হয়েছে লক্ষ্মীপুজোয়। এক মা সন্তান হারিয়েছেন। মন্দির ও জায়গাজমি দখল তো আছেই।

পুজোয় প্রতিমা ভেঙে দেওয়ার চিত্রটি দেখা যাক। শেরপুরে ৪০ বছরের পুরনো মন্দিরের দুর্গাসহ ৩টি মূর্তি ভেঙেছে দুর্বৃত্তরা। নীলফামারির ডিমলায়, টাঙ্গাইলের মধুখালিতে প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, রাজধানীর উপকণ্ঠ সাভারে কয়েকটি মূর্তি ভেঙেছে দুর্বৃত্তরা। হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দুর্গাপুজোর দুটি মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নাটোরে দুর্গাসহ ৬টি মূর্তি, বড়াইগ্রামে একটি ও ফরিদপুরে দুর্গা প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় দুর্গোৎসবের জন্য তৈরি ১৫টি প্রতিমার মধ্যে ৯টি ভেঙে দেওয়া হয়। বড়লেখায় দুর্গা প্রতিমা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পটুয়াখালির বাউফল উপজেলা ও সিরাজগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। বগুড়ায় গাবতলীতে কালী মন্দিরে হামলা করে কালী মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ভালুকা, টাঙ্গাইলের কালিয়াকৈর ও রায়গঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

*দিনাজপুরের পার্বতীপুর দাগলাগঞ্জ বাজারে এক হিন্দুর বাড়ির সামনে গো-মাংসের দোকান।*

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নবগ্রামে মন্দিরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঝিনাইদহে শৈলকূপা উপজেলায় সর্বজনীন শিব মন্দিরের দুটো মূর্তি ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বাগেরহাটের সার্বজনীন দুর্গা মন্দির ও মোল্লাহাটে সর্বজনীন মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। দাকোপে দুর্গা প্রতিমা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনাজপুরে, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে এবং বরিশালের কাউনিয়ায় অপরাজিতা কুঞ্জ মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ফেনীতে সদর উপজেলার জেলেপাড়ায় লক্ষ্মীপুজোয় বাজি পোড়ানোর অভিযোগে হামলা চালানো হয়। তুলসী রাণী দাস নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা গুরুতর আহত হন, ঘটনাস্থলেই মৃত বাচ্চা প্রসব করেন তিনি। স্বামীকে বাঁচাতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। প্রচুর রক্তপাতের পর তুলসী এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই হামলার আঙ্গুল উঠেছে আওয়ামি লিগের কর্মীদের দিকে। পুজোর আগে খবর হয়েছে, বরিশাল শহরের গোরাচাঁদ দাস সড়কের ঊষা সেনগুপ্তের ঐতিহ্যবাহী নাজিরবাড়িটি ক্ষমতাসীন ভূমিদস্যুরা দখল করে নিয়েছে। ভুয়া দলিল আর অস্তিত্বহীন ব্যক্তির নামে ডিক্রি হাসিল করে এ বাড়িটি বিক্রিও করে দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে। জানা যায়, বাড়ি দখল করার জন্যে ওই বাড়িতে যারা বাস করেন তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে বাড়ির অন্যতম বাসিন্দা গোপাল রায় চৌধুরীকে ২০১৪ সালে অপহরণ করে গুম করা হয়। এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি। বাড়িতে বসবাসকারী অন্যরা আদালতে মামলা করেন, আদালত মামলার নিষ্পত্তি না হাওয়া পর্যন্ত পুরো সম্পত্তির ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু আবদুল মান্নান তা অগ্রাহ্য করে। বাড়ির মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।

দখলবাজিতে নতুন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়েছে। তারই অন্যতম নজির দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মন্মথপুর ইউনিয়নের দাগলাগঞ্জ বাজারের রামপ্রসাদ ঠাকুর ও সন্তোষ প্রসাদ ঠাকুরের অসহায় অবস্থা। তাঁরা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৬৪ ও ৮৭ শতক জমিতে রাস্তার ধারে বাড়িঘর তুলে বাস করে আসছেন। ওই জমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে প্রভাবশালী কাজি কুতুবউদ্দিনের। এক পর্যায়ে তিনি দুই হিন্দু পরিবারের ৫০ শতক জমি জবরদখল করেন। এ নিয়ে মামলা হলে রামপ্রসাদ ও সন্তোষ প্রসাদের পক্ষে রায় দেয় আদালত। কিন্তু আদালতের রায়ের পরও জমির দখল ছাড়ছেন না কুতুবউদ্দিন। দখলের নতুন কৌশলে এখন দুই হিন্দু পরিবারকে উৎখাত করতে তাদের বাড়ির ফটকের সামনে মাত্র ১০ গজ দূরে বসানো হয়েছে গো- মাংসের দোকান। ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে দুই পরিবারকে। গত কোরবানির ঈদে রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ রামপুরা এলাকায় চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরের একেবারে সামনেই গোরু কোরবানি করা হয়। মন্দিরের ভক্তরা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানোর পরও জবাই থামেনি। আর এ ঘটনা ঘটিয়েছেন দুই আওয়ামি লিগ নেতা। ■

# বিষ্ণুপুরে রাবণকাটা উৎসব বন্ধ করে দিল প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত ২৪ অক্টোবর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাবণ কাটা উৎসব মহরমের কারণে প্রশাসন বন্ধ করে দিল। এই দিন দেখা যায় সপ্তদশ শতকের প্রাচীন শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ মন্দিরে রথের উপরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তি একধারে কোণায় রাখা থাকলেও প্রতি বছর যে স্থানে বিশাল রাবণের মূর্তি থাকার কথা সে স্থানের পরিবর্তে পাশের গলির ভিতরে রাখা আছে।

দশমীর দিন থেকে রঘুনাথ জীউ মন্দিরকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য এবং লোকশিল্প দেখার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আবাল-বৃদ্ধবণিতা দলে দলে মেলায় ভিড় জমায়। দশমীর দিন থেকে শুরু হয়ে দ্বাদশীর দিন রাবণ কাটার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠানের। লোকশিল্পীর দল দশমীর দিন থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বাজনার তালে, পাটের তৈরি পোশাক এবং কাঠের তৈরি মুখোশ পরে জাম্বুবান, হনুমান, সুগ্রীব সেজে বিষ্ণুপুর শহর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যার পর শহর পরিক্রমা করে এসে প্রথম দিন ইন্দ্রজিৎ বধ করা হয়। একাদশীর দিন কুম্ভকর্ণ বধ ও দ্বাদশীর দিন রাবণ বধের অনুষ্ঠান। প্রথম দুইদিনে তেমন উৎসাহ না থাকলেও শেষ দিনের রাবণ বধ দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়ে। এবারে এই উৎসবে আসা দর্শনার্থীদের হতাশ এবং এক রাশ রাগ নিয়েই ফিরতে হয়েছে।

যাকে ঘিরে এতো উদ্দীপনা সেই উৎসব বন্ধ করার জন্য প্রশাসন উঠে পড়ে লাগে। এই দিন মহরম থাকার জন্য প্রকাশ্যে রাবণ বধ করার অনুমতি মেলেনি। পুরোহিতের ছেলে বিপ্লব মিশ্র জানান, থানায় অনুমতির আবেদন পত্র দিলে তা গ্রহণ করা হয়নি। কারণ হিসেবে তাঁরা জানান ওই দিন মুসলমানদের মহরম। অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রশাসনিক অফিসার-সহ এক গাড়ি পুলিশ এসে ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে বিশাল আকৃতির রাবণের মূর্তিকে গলির ভিতরে রাখতে বাধ্য করে। এই সময় পাশে থাকা একটি ক্লাব সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও, তা প্রশাসন কান দেয়নি। অথচ এই এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস নেই এবং আজ পর্যন্ত এই এলাকার উপর দিয়ে কোনো মহরমের তাজিয়া যায়নি। কেবলমাত্র হুমকি, ভয় এবং গায়ের জোরেই গলির ভিতরে রাবণকাটা অনুষ্ঠান করতে বলে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাতে রাজি হননি। এলাকার জনপ্রতিনিধি-সহ পার্শ্ববর্তী জন প্রতিনিধিদের জানানো হলেও তাতে কোনো লাভ হয়নি।

এ ঘটনার জন্য এলাকাবাসীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অনেককেই বলতে শোনা যায়, আর কোনো দিনই হয়তো প্রকাশ্যে রাবণকাটা যাবে না। এই ভাবেই কি প্রাচীন এই পরম্পরা লোকশিল্প উৎসব বন্ধ হয়ে যাবে? এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনেই স্থানীয় প্রশাসন এরকম করতে বাধ্য হলো।

**কলকাতায় নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে জাতীয় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মঞ্চে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, স্বামী সুপর্ণানন্দ, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ প্রমুখ।**

# ভারত-ইজরায়েল কূটনীতিতে নতুন মাত্রা জুড়ল কৃষি

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিদেশ নীতি যে কেবল অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক উন্নয়নের কচকচিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এদেশের সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনেও সফলভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তা প্রমাণ করল ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্ব। মূলত দেশের প্রতিরক্ষার খাতিরে এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিক কূটনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে গত দেড় বছরে যত্ন নিয়ে এই সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এবার এই সম্পর্ক

*কার্নালের কৃষি প্রকল্প কেন্দ্র।*

নতুনমাত্রা জুড়তে চলেছে এদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে। ঘটনা হলো, ইজরায়েলীয় কৃষি-বিশেষজ্ঞদের উন্নতমানের গবেষণার সাহায্যে ভারতীয় কৃষকরা আরও উন্নতমানের সবজি ও ফল যাতে বছরের ৩৬৫ দিনই একই হারে চাষ করতে পারে, সেই উপায়ও বাতলাবে ইজরায়েলীয় কৃষি-বিশেষজ্ঞরা।

কীরকম হবে এই কৃষি-গবেষণার ফল? সূত্র জানাচ্ছে, যে টমেটো গাছ আমরা সাধারণত ১০ ফুটের দেখতে অভ্যস্থ, তা নেমে আসবে ৩ ফুটে। ফলে একই জায়গায় অনেক বেশি টমেটো চাষ করা যাবে। দ্বিতীয়ত, গরমকালে তরমুজে কামড় বসিয়ে তৃপ্তি পান না এমন মানুষ মেলা ভার। এবার ভরসা রাখুন শীতেও থাকবে তরমুজের ভরা বাজার। দুর্গাপুজো, কালীপুজো কিংবা জগদ্ধাত্রী পুজোয় অনেক বাড়িতেই মায়ের ভোগ হিসেবে তরমুজ দেওয়ার রেওয়াজ আছে। যাঁরা এই অসময়ে তরমুজ কেনেন বা কিনতে একপ্রকার বাধ্য হন, তাঁরাই জানেন প্রায় হাজার টাকার আশেপাশে একটা গোটা তরমুজ জোটে না তাঁদের কপালে। তবে ভারত-ইজরায়েল কৃষি সহযোগিতা বাস্তবায়িত হলে কুড়ি-ত্রিশ টাকাতেই তাঁদের ভাগ্যে জুটে যাবে আস্ত একটা তরমুজ। এরপর বীজহীন বেগুন কিংবা আন্তর্জাতিক মানের ক্যাপসিকাম চাষ সবই রয়েছে ইজরায়েলীয় কৃষিবিদদের পরিকল্পনায়।

এই পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে কার্নালের 'সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস' এবং ইজরায়েলীয় সংস্থা এম এ এস এইচ এ ভি বা মাসাভ। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার, ইজরায়েলের দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট কর্ণাটক সরকার তো রয়েইছে। বর্তমানে দুই ইজরায়েলীয় কৃষিবিদ জোরাম আইসেনস্ট্যান্ড এবং আসের আইজেনকট একটি কর্মশালা পরিচালনা করছেন কার্নালে যাতে কৃষি ও উদ্যানবিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান, কারিগরী কৌশল ইত্যাদি বিনিময় করা যায়। পাশাপাশি এই প্রকল্পে দেশের ন'টি রাজ্যে যথা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং উত্তরপ্রদেশে ২৬টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যেখানে সাধারণ কৃষকদের থাকছে অবাধ প্রবেশাধিকার। যেখানে তাঁরা উন্নতমানের শাক-সবজি, ফুল, আম-সহ বিভিন্ন ফলচাষের প্রশিক্ষণ তো পাবেনই, একইসঙ্গে দুগ্ধ উৎপাদন ও মৌ-পালনের প্রশিক্ষণও পাওয়া যাবে এই কেন্দ্রগুলিতে।

মাসাভের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ডান অ্যালুফের বক্তব্য যে তাঁরা শুধু বেশি উৎপাদনের দিকেই জোর দিচ্ছেন না, একই সঙ্গে গুণগত মানও যাতে উন্নত হয় সেদিকেও খেয়াল রাখছেন। একটা প্রসঙ্গ উঠছে যে সময়ের ফল অসময়ে উৎপাদন করে প্রকৃতির ওপর কোনো অত্যাচার করা হচ্ছে না তো কিংবা বীজহীন সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে খোদার ওপর খোদকারি? বিশেষজ্ঞরা আশ্বাস দিচ্ছেন সময়-অসময়ের বিষয়টি পুরোদস্তুর আপেক্ষিক আর অতীতে কী ছিল না ছিল আজকের দূষণীয় পরিবেশের মাপকাঠিতে তা বিবেচ্য নয়। বরং বর্তমানে কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল। হিমঘর নামক একটি বস্তু এসে যাওয়ায় সময়ের ফল অসময়ে এদেশের বাজারে আমদানি করেই, বরং এতদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ এবং সেইসঙ্গে খানিক লোক-ঠকানোও হচ্ছিল বলে তাঁদের অভিমত। এর সঙ্গে শাক-সবজিতে কৃত্রিম রঙ মেশানো তো ছিলই। বিশেষজ্ঞরা আশ্বস্ত করেছেন ভারত-ইজরায়েলীয় এই নয়া কৃষি-প্রকল্প এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

কৃষকদের মধ্যেও এ নিয়ে আপাতত বিপুল সাড়া। ২৫ হাজার কৃষক ইতিমধ্যেই কার্নালের প্রকল্প কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়েই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার আড়াই হাজার কৃষক গ্রীণ হাউস কৃষি বা পলি-কার্বনেট কৃষি শুরু করেছেন আরও বেশি ও উন্নত ফলনের জন্য। ভারত-ইজরায়েল— এই পারস্পরিক কৃষি সহযোগিতা দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের মানোন্নয়নেরও সহায়ক হবে বলে কূটনীতিবিদরা মনে করছেন।

# মধুচন্দ্রিমার অভিনন্দন রইল

মাননীয় লালুপ্রসাদ যাদব
সভাপতি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল

লালুজী, আজ আপনার সেই বিখ্যাত স্লোগানটা মনে পড়ছে। যবতক সমোসা মেঁ আলু রহেগা তব তক বিহার মেঁ লালু রহেগা। কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর সিঙ্গারা ও আলু থাকলেও বিহারে লালু ছিলেন না। ভারতীয় রাজনীতিতে কামব্যাকের আরও একটা নজির গড়লেন আপনি। বিজেপিকে দুই থেকে ৮৫-তে নিয়ে এসেছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানী। আর ঠিক আদবানীর জন্মদিনেই আবার নিজের দলকে বিহারের এক নম্বর দল হিসেবে তুলে ধরলেন। আপনাকে বিজয় অভিনন্দন।

মনে পড়ছে ১৯৯০ সালের কথা। সেবার বিহারে জনতা দল সরকার গড়বে। পরিষদীয় দলে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে ছিলেন আপনি। কিন্তু উল্টো দিকে প্রার্থী তখনকার প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের লোক রামসুন্দর দাস। তখন আপনাকে রক্ষা করেছিলেন নীতীশ কুমার। তিনটে ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন আপনি। ২৫ বছর পরে সেই নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন আপনি।

এটা কিন্তু ঠিক, এই ভোটের ফল যতটা না নীতীশের জয়, তার থেকেও বেশি আপনার। সংখ্যার হিসেবই বলে দিচ্ছে। সমান সমান আসনে লড়ে আপনার আরজেডি পেয়েছে ৮০টি আসন আর নীতীশের ডেডিইউ ৭১টি। তবুও মুখ্যমন্ত্রী হলেন নীতীশ কুমার। কিন্তু আড়ালে সরকারের চাবিকাঠি কিন্তু রয়ে গেল লালুর হাতেই। সমালোচকরা বলছে, বড় ভাইয়ের হাত ধরে নীতীশ মুখ্যমন্ত্রী হলেও একগুচ্ছ কাঁটা রয়ে গেল ভবিষ্যতের জন্য।

সবাই বলছে, কিছুদিনের মধ্যেই নীতীশের উপর থেকে লালু সমর্থন তুলে নেবেন। অথৈ জলে পড়বেন নীতীশ। তখনই নীতীশ বুঝতে পারবেন আপনার থেকে অনেক অনেক ভালো ছিল বিজেপি-সঙ্গ। তখন নীতীশ হাত খুলে সরকার চালিয়েছেন। আপনি যখন ছেলে বা মেয়েকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে নীতীশের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবেন তখন নীতীশজী বুঝতে পারবেন যাদবের 'দাদাগিরি' কাকে বলে।

তবে নতুন সরকারের মধুচন্দ্রিমার দৃশ্য বেশ উপভোগ্য ছিল। মহাজোটের দুই নেতা মহাজয়ের সন্ধিক্ষণে দুজনকে জড়িয়ে ধরছেন। আহা! নীতীশ নিজেই চলে গিয়েছেন আপনার বাসভবনে। আবার নীতীশের বাড়িতে এসে আপনারা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। আপনি বলেছেন, ''শুরু থেকেই আমরা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে একজোট হয়েছি। জনতা আমাদের জোটকে দু'হাত উপুড় করে ভোট দিয়েছেন। এখন ঝগড়া করলে আমাদের ক্ষমা করবেন না।'' তবে সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার গলার জোরটাই বলে দিচ্ছিল নীতীশের ওপর আপনার খবরদারি চলছে চলবে।

কিন্তু উপ-মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? আপনারা বলেছেন, ''আলোচনা করে ঠিক করব।'' দেখুন ওসব আলোচনা-ফালোচনা আমি বুঝি না। স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এবার বাবা হিসেবে ছেলেমেয়ের প্রতিও আপনার কর্তব্য থাকে। সেটা এবার নিশ্চয়ই করবেন। মিসা কিংবা তেজস্বী কাউকে একটা তো পাঠাতেই হবে। যে আপনার কথা মতো নীতীশ কাকাকে দিনরাত উত্যক্ত করবে। যাইহোক, আপাতত আপনাদের মধুচন্দ্রিমার প্রতি আমার শুভকামনা রইল।

— **সুন্দর মৌলিক**

# হালকা চালে অরাজনৈতিক মন্তব্য বিজেপিকে বিপাকে ফেলেছে বিহারে

বিহারের ২৪৩ আসনের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোটের পরাজয়ের কারণ খোঁজা শুরু হয়েছে। একটা বিষয় স্পষ্ট যে দলের মধ্যেই ভূত ছিল। এই ভূতেদের অন্তর্ঘাতের শিকার হয়েছে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন বিহারে দলকে হারাতে। তাঁকে সাহায্য করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং অ্যান্ড কোং। দলিত সমাজের মানুষজনের সঙ্গে পথের কুকুরের তুলনা করে ভি কে সিং নীতীশ কুমার এবং লালুপ্রসাদকে সুযোগ করে দেন বিহারের দলিত ভোটদাতাদের মহাজোটের সমর্থনে নিয়ে আসতে। ঘটনাটি হয়তো অনেকের জানা। তবু তার পুনরুল্লেখ করছি। বিহার নির্বাচনের প্রচার পর্বে হরিয়ানার ফরিদাবাদে দুইজন বালক খুন হয়। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ভি কে সিং বলেন, 'পথের কুকুরদের পাথর ছুঁড়ে মারলে সরকার দায়ী হবে কেন?" এই ধরনের লুজ টক বা হাল্কা চালে অরাজনৈতিক মন্তব্য সাম্প্রতিকালে বিজেপিকে বিপাকে ফেলেছে। যেমন, বিজেপি প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় যতবার কলকাতায় সরকারি কাজে এসেছেন ততবার সম্পূর্ণ অকারণে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। একটা কথা বুঝতে পারি না যদি মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূল এতটাই ভাল তবে তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেই পারেন। কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রীদের অনেকেই মমতার স্তাবকতা করেন। এর মূল্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে চোকাতে হবে। এইভাবেই বিজেপির অন্দরে দলীয় অন্তর্ঘাত হয়ে চলেছে। বিহারে তারই মূল্য দিতে হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনেও দিতে হবে। কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রী নেতাদের আলটপকা মন্তব্য করা থেকে বিরত না করতে পারলে একা নরেন্দ্র মোদী দলকে জেতাতে পারবেন না।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে সাম্প্রতিককালে ভারতের

**গূঢ় পুরুষের কলম**

ভোটদাতারা কেন্দ্রে জাতীয় দল এবং রাজ্যে আঞ্চলিক দলের জোটকে সমর্থন করছেন। যেমন, ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে দিল্লীর মোট ৭টি আসনের সবকটিই বিজেপি দখল করে। ঠিক তার পরের বছর ২০১৫ সালে দিল্লী বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি আসন পায় বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আমআদমি পার্টি ক্ষমতায় আসে।

প্রসঙ্গত এখানে নীতীশকুমারের মুখ্য প্রচার উপদেষ্টা প্রশান্ত কিশোরের কথা বলা দরকার। গত ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি ছিলেন নরেন্দ্র মোদীর প্রধান প্রচার উপদেষ্টা। সেই নির্বাচনের প্রচার পর্বে মোদী দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্লোগানের নেপথ্যে প্রধান কারিগর ছিলেন প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু পরে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশান্ত কিশোরকে লুফে নেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার। এবারের নির্বাচনে প্রচার পরিকল্পনা তাঁরই। তিনি নির্বাচনী লড়াইকে পরিণত করেন, "বিহারী বনাম বাহারি" লড়াইতে। এই স্লোগানের লক্ষ্য ছিল বিহারের মানুষকে ভুল বার্তা দিয়ে মহাজোটের পক্ষে টেনে আনা। এই লক্ষ্যে প্রশান্ত কিশোর ১০০ শতাংশ সফল। নরেন্দ্র মোদী হলেন বাহারি এবং নীতীশ-লালু বিহারী। আধুনিক প্রচার পরিকল্পনা এবং মনকাড়া স্লোগান যে নির্বাচনে কতটা জরুরী তা বিজেপি নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই দলের মঙ্গল। বিহারের নির্বাচনের শেষ দফার আগে অপরিণতমনস্ক একটি বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে ছাপিয়ে এখন বিজেপি নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনের শাস্তির মুখে পড়েছেন।

বিজেপি মন্ত্রী ভি কে সিংয়ের সৌজন্যে বিহারের দলিত ভোটের একটি বড় অংশ মহাজোটে চলে যায়। তেমনি দাদরি হত্যাকাণ্ড এবং গোমাংস বিতর্ক মুসলমান ভোটদাতাদের নীতীশ-লালুর শিবিরে নিয়ে যায়। বিহারে মুসলমান ভোটদাতারা মোট ১৫ শতাংশ। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এর সবটাই এবার মহাজোটে চলে যায়। অথচ লোকসভার নির্বাচনের সময় বিহারের মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কে চওড়া ফাটল ধরেছিল। বেশ বড় সংখ্যায় তখন তাঁরা নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মতই বিহারেও স্থানীয় প্রভাবশালী কোনো বিজেপি নেতা নেই। যে নেতা একাই দলকে টানতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই বিহার রাজ্য বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে চড়ে নির্বাচনে জয়ী হতে চেয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোট ২৬টি জনসভা করেছিলেন। সেই প্রভাবকে ধরে রাখার মতো বিহারে রাজ্যস্তরের নেতা কেউ ছিলেন না। রামবিলাস পাশোয়ানের প্রভাব যে ক্ষীয়মান সে কথা জানা সত্ত্বেও তাঁর দলকে ৪২টি আসন ছাড়া হয়। নির্বাচনে পাশোয়ানের ভরাডুবি হয়। তিনি নিজে ডুবলেন এবং সঙ্গে বিজেপিকেও ডোবালেন। হ্যাঁ, তবু রামবিলাস পাশোয়ান কেন্দ্রে বড় মন্ত্রী। জিতনরাম মাঝি বড় দলিত নেতা।

# নহে এ কর্ম শ্লাঘনীয়

**শেখর সেনগুপ্ত**

একপেশে একটি অভিযোগের কাঠামো দাঁড় করিয়ে সর্বভারতীয় শোরগোল তোলার অপচেষ্টায় মেতেছেন একদল পুরস্কৃত কিংবা শিরোপাভূষিত লেখক, সিনেমা পরিচালক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ। এঁরা আদতে যে ঘোর বিজেপি বিরোধী এবং তাঁদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যে ইতিহাস ও বাস্তব বর্জিত, আপাত দুর্বোধ্য, তা অনুধাবন করতে খুব বেশি নজির ও তত্ত্বকথাকে হাতড়াতে হয় না। তথাপি রচনার পরিধি যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে যায়, তার মূল কারণ, যা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিটি প্রতিবাদ মূল্যবান। পূর্ণাবয়ব বিবেকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতেই হবে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হতে পারে, এই প্রচারসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বুঝি কোনো এক বা একাধিক গোপন বার্তা বিনিময়ের মাধ্যমে স্থির করেছিলেন প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ কেমনটি হবে এবং কে কবে কোথায় আপন অর্জিত বারুদের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাবেন।

**দাদরিতে গো মাংস রাখায় একজন সংখ্যালঘু খুন হলেন। আর সেটাই নাকি প্রমাণ করল দেশজুড়ে বিস্তারিত অসহিষ্ণুতা! নিহত ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশের পরও বলতে হচ্ছে, এর চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ এমন সমস্ত অসহিষ্ণুতার নজির হাতের কাছে রয়েছে, যা ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষদের অশান্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।**

বিহারে চলেছে বিশেষ স্পর্শকাতর ও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার নির্বাচন। সেখানে জাতপাতের বিষক্রিয়াকে সাধ্যানুসারে দমিত রেখে সুস্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঐশ্বর্যকেই মুখ্য করে তুলতে চেষ্টা করছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর মাস কয়েকবাদে পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভার নির্বাচন। এখানে সদ্যসমাপ্ত তিনটি পুরনির্বাচনে আমরা হতভাগ্য আতুরজনেরা যা প্রত্যক্ষ করলাম, তাকে মর্ত্যের বিষাদ বলা চলে। গণতন্ত্র বড় পবিত্র সম্পদ। কয়েক দশক ধরে আমরা তাকে লুণ্ঠিত হতে দেখেছি। বহু জ্বালা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে; যে কোনো মুহূর্তে যদি উপচে পড়ে বা দপ করে জ্বলে ওঠে, বলদর্পী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বাহারি রঙমশাল দ্রুত নিভতে থাকবে। আশা রাখছি, সাংবাদিক নিগ্রহ সমেত ওই সমস্ত পাশবিক ও অগণতান্ত্রিক মহাকীর্তির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার যাবতীয় কঠোর ব্যবস্থাদি আগতপ্রায় নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সুনিশ্চিত করবে। অন্যদিকে, দেশের ইতিউতি চলছে আলো-অন্ধকারের টানাপোড়েন। দীর্ঘ ছয় দশক ধরে তিলে তিলে বর্ধিত ও চর্চিত বিষফলটি এক্ষণে অনেকটাই পরিপক্কতা পেয়েছে, মোচড় দিতে শুরু করছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও অবিচ্ছেদ্য জাতীয়তাবোধকে দ্রুত হীনবল করে তুলতে। তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সংখ্যালঘুত্ব' এই দুই সারশূন্য অভিধাকে সূচীমুখ করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার মওকাকে নিরঙ্কুশভাবে পুনরায় আপন আপন কব্জায় আনবার জন্য দীর্ঘকালের সুবিধাভোগীরা এখন চতুর্দিকে প্রায় সকল ধরনের চাতুরি প্রদর্শনে মরিয়া। সেই চাতুর্য কোথাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক; কোথাও বহুমাত্রিক; ওই সূত্রে আহত আমাদের পরম্পরা, ধর্মবোধ, পাপপুণ্য বিভাজন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা নিরাপদে স্বদেশে বেঁচে থাকবার অধিকার পর্যন্ত!

চতুর্দিকে দীর্ঘকালের লালিত সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত যা সবিস্তারে লিখতে গেলে একটি ঢাউস বই হয়ে যাবে। এখানে এক-আধটির উল্লেখই যথেষ্ট পটভূমি নির্মাণে। এইগুলি নিম্নরূপ :

* বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে অসম ও পশ্চিমবাংলার সীমান্ত দুয়ারকে হাট করে খুলে রাখা, যাতে ক্রমাগত অনুপ্রবেশকারীরা এই দুই রাজ্যে ঢুকে গোটা ডেমোগ্রাফিটাকেই বদলে দিতে পারে তখতে আসীন রাজনৈতিক দলগুলির আশু সুবিধার্থে।

* অভিন্ন সিভিল রুলকে ঠাণ্ডা ঘরে আবদ্ধ রেখে জনসংখ্যায় মারাত্মক ভারসাম্যকে নিশ্চিত করা।

* সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ বটিকাকে নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে ধারাবাহিকভাবে তাদের প্রলুব্ধ করা, ইত্যাদি।

বুকে হাত দিয়ে ভাবুন, এমন কোনো শিক্ষিত নাগরিক কী আছেন, যিনি এইগুলি সম্পর্কে অবহিত নন? প্রত্যেকে জানেন। যাঁরা বলেন, জানা নেই, তাঁরা জেগে ঘুমান অথবা তাঁদের চোখে কুটো কিংবা বিলক্ষণ জ্ঞানপাপী। এখানে নীতিসুধার কোনো স্থান নেই। বাইবেলে যেমন আমরা দেখি, সাপ ইভের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল পাপ। আমাদের এই দেশেও স্বাধীনতার লগ্নে

তখতে যিনি বসেন তিনি ওই পাপকেই লালন করবার কৌশলটিকে শিখিয়ে দিয়ে যান উত্তরসূরিদের। এ দেশে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান— সকলের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের বাণী সমেত একপ্রকার কানুন, আর মুসলমানদের জন্য আর একরকম। এটা কোন জাতের গণতান্ত্রিক দ্যোতনা? ক্ষমতালিপ্সুদের এমত কার্যধারায় নিহিত তাৎপর্য কেবল একটাই— দূর ভবিষ্যতে এই দেশ যেন আবার দ্বিখণ্ডিত হয়।

হরেক বচনের আড়ালে খেলাটা চলছিল বেশ। সচেতন নাগরিকদের ক্ষোভ বাড়ছিল। ফলে ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ের কাণ্ডারির নাম নরেন্দ্র মোদী। লোকসভার নির্বাচনে এই প্রথম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই আদত মানবিক মহিমা বিস্তারিত হলো।

গদিচ্যুত সুবিধাবাদী কর্তা-কর্ত্রীরা সর্বান্তঃকরণে চাইলেন নতুন সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমুখী প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দিতে। হাতে তাঁদের দু'টো তুরুপের তাস— রাজ্যসভায় এনডিএ-এর সংখ্যাধিক্যের অভাব এবং দেশজুড়ে 'সংখ্যালঘু'দের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন। এরপর যদি বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ পারানির কড়ি জোগাড় করে নিতে পারে, বিরোধীদের রাজ্যসভা-ক্যারিশমা করুণা-বঞ্চিত হবেই।

হাতেও নেই পর্যাপ্ত সময়। সুতরাং দিকে দিকে শুরু হয়েছে বিবিধ চাতুর্যের গ্রন্থিমোচন। যে সমস্ত ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া আমরা পর পর প্রত্যক্ষ করছি, তাতে অনুমান করা যায় বিভিন্ন বিরোধীদলের কুশলী পঙ্গুবরা সরকারের ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপনে ও দৈন্য প্রমাণে কিছু অসচরাচর অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তদনুসারে যে কোনো একটা ঘটনা বা সূত্রকে ধরে তামাম দেশজুড়ে তাঁদের ঢক্কানিনাদ শুরু হয়ে যায়। এ কাজে তাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত এবং তাৎক্ষণিক সাফল্যে তাঁদের আত্মসন্তুষ্টিও পর্যাপ্ত। তাঁরা আবার নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে এটাও জানেন যে, আজকের ভারতে সাধারণ ভোটারদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে থাকেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। তাঁরাই পারেন বনের পাখিকে খাঁচার দিকে আমন্ত্রণ জানাতে। যখনই রুষ্ট মধ্যবিত্ত মোহময়তা থেকে বেরিয়ে আসেন, তখনই ক্ষমতাবানরা ক্ষমতাচ্যুত হন। মধ্যবিত্তকে উতলা করতে পারলে জনপথ ছেড়ে আবার রাজপথে ফিরে যাওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিত্তে তাঁরাই উচ্চাসনে আসীন, কর্মে ও অবদানে যাঁরা সৃষ্টিশীল। এঁরা লেখক, দার্শনিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী প্রমুখ। এই বিশিষ্টদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁরা প্রচারের আলোয় এসে নিত্য-নতুন আপখোরাকির সন্ধানে ব্রতী হওয়াকে অপছন্দ করেন। তাই প্রকৃত গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অর্থ ও যশ অতি পরিমিত। মিডিয়ার দৌলতে বারংবার উচ্চারিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপে প্রায়শ সাড়া প্রদানে অভ্যস্ত, আত্মশক্তির চেয়ে ক্ষমতাবানদের আনুকূল্যে যাঁদের উদ্বোধন ও প্রসার— এরকম 'ইনটেলেকচুয়ালদের' নামই আমরা বার বার শুনে থাকি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা ক্ষমতাবানদের দ্বারা পুরস্কৃত হন, খেতাব পান। এটাই হয়ে ওঠে তাঁদের জীবনে সুচারু পূর্ণতা লাভ। এঁদের মধ্যে অনেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবানের অবদানকে ভোলেন না এবং দুঃসময়ে যথাসম্ভব তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এঁদের একাংশের এমত চিত্ররূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সম্প্রতি। শুরু যিনি করেছিলেন, তাঁর অহংবোধ অন্যদের তুলনায় এক চিলতে বেশি। কারণ যতদিন যাবে, তাঁদের অন্বিষ্ট আর অরক্ষণীয়ার মর্যাদা পাবে না। জৌলুস বিলীয়মান হবে যুক্তির শাণিত আঘাতে এবং সমকালীন চিন্তাশীল মানুষের বিরক্তি ও ধিক্কারে।

অনস্বীকার্য, এ যাবৎ যে সকল প্রতিভাবান ও স্রষ্টারা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কালজয়ী। কয়েকজন যথার্থ আদর্শের খাতিরে অথবা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে পুরস্কার অথবা খেতাব ত্যাগ করে বা গ্রহণে অস্বীকার করে ইতিহাসে নমস্যও হয়ে আছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জর্জ বার্নাড শ, জাঁ পল সাঁর্ত্রের নাম এই প্রসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়।

কিন্তু এদেশে পুরস্কার ও খেতাব ত্যাগের যে নতুন ছক ও বাহার দেখতে পাচ্ছি, তাকে কিন্তু চিন্তাশীল মধ্যবিত্তরা যথার্থ সঙ্কট বলে মনে করবেন না এবং এর পিছনে কোনো তাত্ত্বিক ভাবনা গড়ে উঠবে

*Swachchha Bharat Swabolombee Bharat*
**How to build a nice home, think of us**
**WE PROVIDE :-**
+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.
***Contact***
**ABC ENGINEERS & SERVICES**
**"PARK PLAZA"** Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

বলে বিশ্বাস করি না।

পুরস্কার বা খেতাব-ত্যাগীদের অভিযোগটা কী?

অভিযোগের ভাষা ও অভিমুখ একেবারে অভিন্ন। দেশে নাকি এখন অসহিষ্ণুতার ঘোর বাতাবরণ। 'সংখ্যালঘু'রা অতি বিপন্ন। তাঁদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য ব্যাপারগুলিতে খুব বেশি নাক গলানো হচ্ছে।

বাহ্! কী মনে করেন এঁরা? আমরা কী '৮৪ সনের সেই ব্যাপক ও ভয়াবহ শিখ নিধনের উৎসবকে বিস্মৃতির তুলসীমঞ্চে চাপা দিয়ে রেখেছি? সেই দিনগুলিতে পুরস্কার প্রাপকদের বিবেক ও সাহসিকতাকে বন্ধক রাখা হয়েছিল কোন্ মহাজনের কাছে? খেতাব বা পুরস্কার ফেরত দেওয়া দূরের কথা, এই ত্যাগীদের ক'জন সেদিন প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন? যুক্তি ও কার্যক্রমের পুঁজিকে অমন তলানিতে রেখে বাহাদুরি না দেখালেই পারতেন এঁরা। বরং এই বঙ্গে আমরা কিছু প্রতিভাবান ও দীপ্ত বুদ্ধিজীবীর নির্ভেজাল সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলাম প্রায় সাড়ে তিন দশকের অনাচারে স্ফীত জগদ্দল পাথরটাকে সরাবার সময়। বৃদ্ধ কবি তরুণ সান্যালকে দেখেছি খোঁড়াতে খোঁড়াতে নন্দীগ্রাম ছুটে যেতে। দেখেছি সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে। কবি শঙ্খ ঘোষকে প্রতিবাদে মুখর হতে দেখেছি। নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন ফেটে পড়েছেন বিক্ষোভে। এঁরা কিন্তু পরে প্রসাদলাভের আশায় লাইন দেননি। বরং এখন যাঁরা ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে সক্রিয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এঁরা যথেষ্টই মুখর। আর ওই যাঁরা পুরস্কার/ খেতাব ছেড়ে দিয়ে সংবাদের শিরোনামে আসবার দৌড়ে রয়েছেন, তাঁদের একজনও কী পুরস্কার দাতাদের বিরুদ্ধে মানবিকতার খাতিরে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সামিল হতে পেরেছিলেন ইতিপূর্বে? ভয়ঙ্কর সমস্ত অপরাধ-অনাচার ঘটে যাবার পরও খেতাব বিসর্জনের কথা ভাবতে পেরেছিলেন? পারেননি। কারণ, তাঁরা সেই বিশেষ খাঁচার পোষা পাখি।

'দাদরিতে গো মাংস' রাখায় একজন সংখ্যালঘু খুন হলেন। আর সেটাই নাকি প্রমাণ করল দেশজুড়ে বিস্তারিত অসহিষ্ণুতা! নিহত ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশের পরও বলতে হচ্ছে, এর চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ এমন সমস্ত অসহিষ্ণুতার নজির হাতের কাছে রয়েছে, যা ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষদের অশান্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সনাতন ধর্ম মানুষকে সহনশীলতা দেয়। মিথ্যাচারকে ঘৃণা করতে শেখায়। কিন্তু বার বার যদি রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করতে গিয়ে সনাতন পরম্পরাকে রক্তাক্ত করা হয় স্বদেশে ও বিদেশে, কঠিন প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নিত্য অত্যাচারের অজস্র ঘটনা প্রতিদিন আমাদের দেশে ঘটেছে। দিল্লী বা কামদুনির গণধর্ষণের প্রতিবাদে শত শত মোমবাতি জ্বলেছে। কিন্তু একজনও পুরস্কৃত ইনটেলেকচুয়াল ক্ষোভে মাথা থেকে শিরোপাটিকে নামিয়ে রাখেননি। এই রকম আচরণকে নিছক দ্বিচারিতা বা আত্মপ্রবঞ্চনা বলা ভুল। এর পিছনে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিটির রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্বঋণ পরিশোধ করতেই হয়। সাংস্কৃতিক মুখোশটাকেও আর ধরে রাখা গেল না।

আবারও বলি, আমাদের দেশটি বিশাল এবং হাজারো বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এখানে কোথায় কখন কোন্ ঘটনা ঘটছে, তার সার্বিক খুঁটিনাটি তথ্য সবসময় গোচরে আসে না। এই অবস্থায় তাবৎ সকল ঘটনার দায় কি তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত? ঘটনার প্রতিবিধানে প্রশাসনিক পদ্ধতি থাকে। একটি ঘটনার পিছনে হয়তো থাকে আরও বহু ঘটনার স্বেদযুক্ত স্মৃতি ও আশঙ্কা। সুস্থ, সুন্দর, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা রয়েছে এই দেশে। ইত্যাকার শুভ চেতনাকে বাদ দিয়ে এঁরা নিজেরাই কী অসহিষ্ণুতার কাছে আত্মসমর্পণ করছেন না? পালা করে পুরস্কার ও খেতাব বিসর্জন দিয়ে তাঁরা যে এপিটাফ রচনা করে যাচ্ছেন, তাতে কিছুকালের জন্য প্রচার তাঁরা পাবেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কিছুটা সিদ্ধ হবে, কিন্তু মানুষকে স্থায়ীভাবে বিভ্রান্ত করা যাবে না। সময়ের চিলেকোঠায় তাঁদের প্রতিকৃতি এক সময় বিবর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকবে মাত্র। আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়— তাঁরা যে পুরস্কার পেয়েছেন, তাতে কিন্তু কোনো সরকারি মোহর লাগানো নেই। তাঁদের নির্বাচিত করেছিল নির্দিষ্টভাবে গঠিত প্যানাল, যে প্যানালের গঠনে আবার তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব অনস্বীকার্য। মাননীয় ব্যক্তিগণ নিজেরাও জানেন, সমকালে প্রকৃত অসহিষ্ণুতার অভিপ্রকাশ কোথায় কোথায় ঘটছে। এদের খোঁজ মেলে জনসভার মঞ্চে উঠে নেতা-নেত্রীর অশালীন ভাষণ ও অঙ্গভঙ্গীমায়, সিন্ডিকেটিয় হানাহানিতে, নির্বিচার মহিলা নির্যাতনে, আদালত অবমানার সীমাহীন স্পর্ধায়। তালিকাটি এত দীর্ঘ যে বাধ্য হয়ে ইতি টানছি।

*(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক)*


## ।। আহ্বান।।

পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাবলম্বী সুরভি গ্রাম' নির্মাণার্থে গোসেবা করতে ইচ্ছুক দম্পতিদের আহ্বান করা হচ্ছে, যাঁরা ন্যূনতম ২ বছর সময় দিতে পারবেন। মাসিক বেতন সহ থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

— : যোগাযোগ :—

**গোসেবা পরিবার**

মো :- ৯৩৩১০২৭৪৭১

৯৮৩০১৫৬৯৬৮

# পুরস্কার ফেরত একটি ষড়যন্ত্র

**রমানাথ রায়**

পুরস্কার কি ফেরত দেওয়া উচিত? নাকি ফেরত দেওয়া যায়? এ প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৬৩ সালের ঘটনা। তখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রাবন্ধিক ওক্তাভিও পাজ ভারতে এসেছিলেন মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হয়ে। সেই সময় ব্রাসেলস থেকে তাঁর কাছে একটা টেলিগ্রাম আসে। সেই টেলিগ্রামে জানানো হয়, তাঁকে এবার তাঁর কবিতার জন্যে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। খুবই সম্মানজনক এই পুরস্কার। অনেক বিখ্যাত কবি এই পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এই পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন। কারণ ওক্তাভিও পাজ এর আগে কোনোদিন পুরস্কার গ্রহণ করেননি এবং পুরস্কার পেতেও চাননি। তিনি মনে করেন কবিতা লেখা হয় নিভৃতে। আর পুরস্কার দেওয়া হয় জনসমক্ষে। ফলে তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। বুঝতে পারেন না তিনি কী করবেন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন, নাকি বর্জন করবেন? সেই সময় লেখক রাজা রাও তাঁকে মা আনন্দময়ীর কাছে নিয়ে যান। মা রাজারাও-য়ের কাছে সবই শুনেছিলেন। তিনি ওক্তাভিও পাজ-য়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর ঝুড়ি থেকে একটা কমলালেবু তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ওক্তাভিও পাজ কমলালেবুটি লুফে নিলেন। মা বোঝাতে চাইলেন, জীবন একটা খেলা ছাড়া কিছু না। আমরা এই খেলায় পুতুল মাত্র। তারপর তিনি বললেন, তুমি বিনম্র চিত্তে এই পুরস্কার গ্রহণ করো এবং এই মনে করে গ্রহণ করো যে এই পুরস্কারের মূল্য নগণ্য অথবা কোনো মূল্যই নেই। আর যদি তুমি এই পুরস্কার না গ্রহণ করো তাহলে এই পুরস্কারকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা এর প্রাপ্য নয়। সুতরাং পুরস্কার মৃদু হেসে নিরাসক্ত চিত্তে গ্রহণ করা উচিত, যেভাবে তুমি আমার কমলালেবু গ্রহণ করেছ। গীতার নিরাসক্তিই শেষ কথা। ওক্তাভিও পাজ তারপর পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন দান করা এবং গ্রহণ করা একই কাজ, যদি তার মধ্যে নিরাসক্তি থাকে। নিরাসক্তি থাকলে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

আজ যখন দিকে দিকে পুরস্কার ফেরত দেওয়ার হিড়িক দেখা দিয়েছে তখন আমার এই ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমার প্রথম প্রশ্ন : যাঁরা এই পুরস্কার ফেরত দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, তাঁরা কারা? কে তাঁদের নাম জানে? এঁদের নামের সঙ্গে আমাদের কারো পরিচয় নেই। এইসব লেখক- পরিচালক-বৈজ্ঞানিকরা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের কেউ চিনত না, জানত না। না জানারই কথা। কারণ এঁরা কেউ যোগ্যতার বিচারে পুরস্কার পাননি। ভারতবর্ষে কেই বা পায়? এঁদের অধিকাংশ কংগ্রেসের মদতপুষ্ট কিছু মানুষ, যাঁরা কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেসের সেবা করে পুরস্কার হাতিয়ে ছিলেন। আজ এঁরা পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন। যদি এটাকে আঘাত বলে ধরে নিই তাহলে যাঁরা তাঁদের পুরস্কার দিয়েছিলেন, তাঁদেরকেই আঘাত করা হচ্ছে। এতে বর্তমান সরকার কী করতে পারে? ফলে পুরস্কার যাঁরা ফেরত দিচ্ছেন তাঁরা হাসির খোরাক হয়ে ওঠছেন। এতে অবশ্য তাঁদের কিছু যায় আসে না। তাঁদের নাম কেউ জানতো না। এই সুযোগে তাঁরা টিভি ও খবরের কাগজে একটা আত্মপ্রচারের পথ খুঁজে পেলেন। এ থেকে বোঝা যায় সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারকে তাঁরা কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের কাছে শিল্পের চেয়ে পুরস্কার ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক সময় পুরস্কার পাওয়ার জন্যে হেন অপকর্ম নেই যা তাঁরা করেননি। কিন্তু পুরস্কার পেয়ে তাঁদের লাভ কিছু হয়নি। তাঁরা হারিয়ে গেছেন। আজ তাই পুরস্কার ফেরত দিয়ে নাম কিনতে চাইছেন। নামের এই মোহ লজ্জার, খুবই লজ্জার! কিন্তু এটাই কী শেষ কথা? নাকি এর পিছনে অন্য কিছু আছে?

এবার প্রশ্ন : কেন এইসব মানুষেরা পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন? এর কারণ নাকি ব্যাঙ্গালুরু ও দাদারির হত্যাকাণ্ড। হত্যা খুবই ঘৃণ্য এবং নারকীয় কাজ। কোনো সুস্থ মানুষ

**গম্ভীর বিষয়, ভারত মোটেই অসহিষ্ণু নয়। অসহিষ্ণু হলে যে যার মতো করে বক্তব্য রাখতে পারত না। এই ধরনের ঘটনাগুলি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তের সৃষ্টি করে। এবং এই ধরনের বিষয়গুলি অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না।**

*রূপা গাঙ্গুলী*
*চলচ্চিত্র অভিনেত্রী*

**সবাই বিশেষ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ফেরত দেওয়ার নাটক করছেন। শুনতে খারাপ লাগলেও অনেকেই সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নন। কংগ্রেসের সুপারিশেই কারও কারও ভাগ্যে পুরস্কার জুটে ছিল। তাঁরাই এইসব নাটক করছেন।**

*সুমিত্রা ঘোষ*
*সাহিত্যিক*

এই হত্যা সমর্থন করে না, করতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাজনৈতিক এবং বিশেষ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো লেখক যদি সত্যিকারের প্রতিবাদী হন তাহলে তিনি অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করবেন। তিনি চুপ করে থাকবেন না। কারণ সমাজে অন্যায় দেখে চুপ করে থাকা তাঁর ধর্ম নয়। বিশেষ কোনো স্বার্থে আমি কোনো অন্যায় দেখে চুপ করে থাকব, আবার বিশেষ কোনো স্বার্থে আমি প্রতিবাদী হয়ে উঠব— এ হয় না। এটাকে দ্বিচারিতা বলে। কংগ্রেস বা বামপন্থায় বিশ্বাসী মানুষেরা চিরকালই সুযোগ সন্ধানী, চিরকালই সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের প্রসাদ পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকেন। এঁরা একটা ভুয়ো আদর্শের লেজ ধরে ঝুলতে ভালোবাসেন। এতে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই ১৯৮৪ সালে যখন শিখদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হলো তখন কোনো দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের চোখের জল ফেলতে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, এই হত্যাকাণ্ডকে জনরোষ বলে চালানো হয়েছিল। আর, এই সব কথা কারা বলেছিলেন? বলেছিলেন কংগ্রেসের বুদ্ধিজীবীরা। তখন কোথায় ছিলেন ইরফান হাবিব এবং রোমিলা থাপার? কংগ্রেসের কৃপাধন্য এই সব ঐতিহাসিকরা হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করতে যতখানি তৎপর, সেইরকম তৎপরতা তাঁদের তখন দেখা যায়নি। দাদরি কাণ্ডে নিহত হয়েছে একজন মুসলমান। তার অপরাধ, গো-হত্যা এবং গো-মাংস ভক্ষণ। বেদের কথা অনুযায়ী এটা অপরাধ, ভয়ঙ্কর অপরাধ। ঋকবেদের অষ্টম মণ্ডলে (১০১।১৫) বলা হয়েছে গোরু যে অদিতি, তাকে বধ কোরো না। যজুর্বেদে (৩০।১৮) আছে 'অন্তকায় গোঘাতম্'। অর্থাৎ গোঘাতকের শাস্তি প্রাণ দণ্ড। খগ্বেদে (১।১১৪।১০) আছে গোহত্যাকারী ও নরহত্যাকারী দূর হও। সুতরাং বৈদিক দৃষ্টিতে গোহত্যা ও নরহত্যা সমান। উভয়েরই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। বর্তমানকালে আমরা এতখানি কঠোর হতে পারি না। কঠোর হতে চাই না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা মুসলমান নিহত হলে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন, অথচ কাশ্মীরে হিন্দু নিহত হলে তাঁদের এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখা যায় না। এইসব মানুষ গোধরায় রামসেবকরা নিহত হলে মুখে কলুপ এঁটে থাকেন, কিন্তু গুজরাট দাঙ্গায় মুসলমান মরেছে বলে তাঁদের চিৎকারে চারদিক কাঁপতে থাকে। গাজায় মুসলমান মরলে এই বুদ্ধিজীবীরা

**আলটপকা নাম কিনতে চান বলেই পুরস্কার ফেরত দেওয়ার চিন্তা। সেদিন হাসতে হাসতে নিলে, তখন নীতি কোথায় ছিল? পুরস্কার ফেরত দিলেই অসহিষ্ণুতা কেটে যাবে? টাকা ফেরত দিলে সুদ সমেত ফেরত দেওয়াই উচিত। আসলে এর মধ্যে না আছে রাজনীতি, না আছে সমাজনীতি আর না আছে নিজের নীতি। এই অসহিষ্ণুতা প্রথা! এটা কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ অদৃশ্য অসহিষ্ণুতাকে ধরে নিয়ে এক গল্প-গুজব বাজারে ছেড়েছে। এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে বিশেষ কতকগুলো রাজনৈতিক দলের মানুষ। আর তাকে মূলধন করছে এক শ্রেণীর মিডিয়া**

*গোপালকৃষ্ণ রায়*
*সাহিত্যিক*

*ড. নরেন্দ্র কোহলী*
*হিন্দী সাহিত্যিক*

**সংবাদপত্রে পড়ছি যে, অনেক লেখক সাহিত্য আকাদেমি থেকে পাওয়া পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কেউ লেখার স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে বলে ফেরত দিচ্ছেন। কেউ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফেরত দিচ্ছেন। কেউ নিজ সম্প্রদায়কে হাতে রাখার জন্য ফেরত দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এটা রাজনীতির খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ঘটনার সঙ্গে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ও সাহিত্য আকাদেমির কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও তাদের দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে ঘটা ঘটনা যা অন্য সরকারের আমলে ঘটেছে তার জন্য এখন পুরস্কার ফেরতের হিড়িক কেন পড়েছে তা আমার মাথায় আসছে না। আমি ভাবছি যে, এই লেখকরা তাদের অন্তরাত্মা জাগ্রত হওয়ার জন্য পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন, না কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাধ্য হচ্ছেন? কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশে ঘটা ঘটনার জন্য সেই রাজ্য সরকারের কাছে কেন জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে না? যেভাবে এটা চলছে তাতে মনে হয় এই লেখকরা বাংলাদেশে ব্লগার হত্যার জন্যও নিজের দেশের সরকারকে দায়ী করবে।**

*মণিকা মোহিনী*
*হিন্দী সাহিত্যিক*

**পুরস্কার ও সম্মান ফেরত দেওয়া মতভেদ জাহির করার এক পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিছু লেখক পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন, কিন্তু এতে সাহিত্য আকাদেমির কী করার আছে? আমি এদের জিজ্ঞাসা করছি— এত বছর আপনারা পুরস্কার উপভোগ করেছেন, তার মধ্যে অনেক অনৈতিক কাজ হয়েছে, তখন আপনাদের বিবেকে ধাক্কা লাগেনি? ২০১২ সালে নির্ভয়ার গণধর্ষণ ও তার ফলে তার মৃত্যুর পর পুরস্কার ফেরত দিতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়েছিল, তখনও আপনারা নির্বিকার ছিলেন। জঙ্গি আক্রমণে এত প্রাণ গিয়েছে, তার প্রতিবাদ আপনারা করেননি। শুধুমাত্র একটি মজহবের মানুষের চিন্তা আপনাদের সর্বোপরি? দেশে ক্রোধ জাগ্রত হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটছে, সব ঘটনায় আপনাদের ক্রোধ জাগা উচিত।**

প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন, অথচ পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে হিন্দু খুন হলে তাঁদের গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। এর উদ্দেশ্য একটাই : মুসলমান ভোট। এই ভোটের রাজনীতিই ভারতবর্ষকে রসাতলে পাঠাচ্ছে। মুসলমানদের যদি ভোটাধিকার না থাকত তাহলে মুসলমানদের হয়ে এই ওকালতি বন্ধ হয়ে যেত। হিন্দু ভারতবাসীরা অনেক সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারত। মুসলমানদের ভোটাধিকার থাকার ফলে তা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্যে দায়ী কুচক্রী ধান্দাবাজ নেহরু এবং তাঁর প্রসাদপুষ্ট ভক্তবৃন্দ। এই ভক্তরাই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলছে। কিন্তু কার সঙ্গে ঐক্য? যারা হিন্দুদের কাফের বলে মনে করে, তাদের সঙ্গে ঐক্য সম্ভব নয়। চিত্তরঞ্জন দাশের এক প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।' কিন্তু তা হয়নি। মোগলরা এই ভারতের সংস্কৃতিতে লীন হতে পারেনি। তারা নিজেদের আলাদা করে শুধু রাখেনি, ভারতের ভূখণ্ড থেকে এক টুকরো ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষতি সাধনে আজও তৎপর। মুসলমানরা মানুষ না হয়ে মুসলমানই থেকে গেছে। এই মুসলমানদের জন্যে যারা চোখের জল ফেলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির শত্রু, ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। এদের পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে গিয়ে বাস করা উচিত। এরা মুসলমান পাড়ায় গোরুর মাংস খেয়ে বাহাদুরি দেখাবে, কিন্তু সেখানে শূকরের মাংস খেয়ে বাহাদুরি দেখাবে না। এই হচ্ছে এদের চরিত্র। এদের কি এদেশে রাখা উচিত? মুসলমানদের এইভাবে ভোটের জন্যে তোয়াজ করে তারা দেশের সর্বনাশ করছে। তারা কি তা জানে না? তারা কি জানে না যে মুসলমান শেষ পর্যন্ত মুসলমানই থাকে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ হয় না। তারা সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনে বিশ্বাস করে না। হিন্দুরা যা করে তার উলটোটা করাই তাদের ধর্ম। এক হিন্দু কবি এক মুসলমান সাংবাদিকের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান সাংবাদিক কবিকে বললেন, আমাদের কোনো কুসংস্কার নেই। আমি আমার স্ত্রীকে গোস্ত রান্না করতে বলেছি। আপনার নিশ্চয় এতে কোনো আপত্তি নেই? কবি উত্তরে বললেন, তুমিও নিশ্চয় আমার মতো মুক্ত মনের মানুষ? মুসলমান সাংবাদিক বললেন, হ্যাঁ। তা শুনে কবি বললেন, তাহলে এক কাজ করো। আমি গোস্ত খাব। কিন্তু তোমাকে শুয়োরের মাংস খেতে হবে। মুসলমান সাংবাদিক তা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, তা হয় না। আমরা বরং মুরগীর মাংস খাই। এ গেল কুসংস্কারের গল্প। এবার একটা হিন্দু বিরোধিতার গল্প বলি। একবার এক বটগাছের নিচে বড় কড়াইয়ে মাংস রান্না হচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ গাছের ডাল থেকে একটা কাক কড়াইয়ের মধ্যে বিষ্ঠা ত্যাগ করল। সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। কী করা যাবে এখন? মাংস কি ফেলে দেওয়া হবে? তখন একজনকে বলা হলো, তুই হিন্দু পাড়ায় যা। জেনে আয় এরকম অবস্থায় হিন্দুরা কী করে। লোকটি হিন্দু পাড়ায় গিয়ে ফিরে এসে বলল, হিন্দুরা এরকম অবস্থায় মাংস ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হলো, তোরা তাহলে মাংস খেয়ে নে। এই হিন্দু বিরোধিতা থেকে গো-মাংস ভক্ষণ, কলারপাতা উলটো করে খাওয়া, আড়াই পোচে প্রাণী হত্যা করা ইত্যাদি।

১৯৪২ সালে ৮ আগস্ট পিপ্‌লস ওয়ার' পত্রিকায় বামপন্থীরা লিখেছিল, 'Behind the demand for Pakistan, there is justified desire of the people of Muslim nationalists.' এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বংশধর কি আবার দেশভাগ চাইছে? আবার দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের মধ্যে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করতে চাইছে? চাইছে শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলতে? সেই জন্যেই কি পুরস্কার ফেরতের নাটক? এর পিছনে এক গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে মনে হয়।

*(লেখক বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক)*

# উদারবাদীদের আসল রূপ

**চেতন ভগত**

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দু'টি শিবিরের যুযুধান অবস্থান তুমুলভাবে উঠে আসছে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থী শিবির। এঁরা মূলত জাতীয়তাবাদী হিসেবেই পরিচিত। বিদ্রূপাত্মক বা অবহেলাভরে এঁদের ভক্তের দল, সঙ্ঘি বা চাদ্দিওয়ালা হিসেবেই তথাকথিত মুক্তমনের অধিকারীরা তকমা দিয়ে থাকেন। কেননা এঁরা হিন্দুত্ববাদী ও মোদী বা বিজেপির সমর্থক। আরও বদগুণের মধ্যে এঁরা আরএসএস-এর সমর্থক (যারা একেবারেই মান্ধাতা আমলের উদ্ভট মাপের হাফ প্যান্টকে ইউনিফর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছে)।

মনে রাখতে হবে, যে বাহিনী এই লেবেল মেরে দিচ্ছে তারা কিন্তু সেই অন্য শিবিরের মহাজন। তারা নিজেদের জন্য একটি বাহারি তকমা সংরক্ষণ করে রেখেছেন 'উদারবাদী' (Liberal)। এটা শুনলেই মনে হতে পারে এক গুচ্ছ দারুণ প্রজ্ঞাবান লোক দামি কাপে চা খেতে খেতে দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে অত্যন্ত গূঢ় কোনো বৌদ্ধিক বিষয় সম্পর্কে একে অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করছে বা নিবিড় চর্চায় মগ্ন— মানসপটে সাজিয়ে একটু কল্পনা করলেই দেখেবেন ভেসে উঠছে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীদের ভাবমূর্তি কল্পনা করলেই মনে আসবে একদল লোক কিসের ভাবনায় যেন উন্মাদগ্রস্ত হয়ে খোলা রাস্তায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে চলেছে।

কিন্তু আজ আমি আপনাদের বলবই— এই যারা নিজেদের 'উদারবাদী' বলে পরিচয় দেয় আসলে তারা কারা। আমাদের দেশে এই তথাকথিত উদারবাদের ভূমিকা কেমন তা জানেন কি? বস্তুত অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রেই হোক সে সম্পর্কে এদের আদৌ কোনো ধারণাই নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন এঁরা কখনও কোনো সমস্যার সমাধানের নিদান দেননি। যে কারণে কেউই সঠিক করে বলতে পারবেন না তাঁরা কাদের বা কিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কিন্তু তাঁরা রয়েছেন। ভীষণভাবেই রয়েছেন এবং ঠিক যেমনটি আন্দাজ করা যায় ঠিক গোরু-ছাগলের পালের মতো দলবদ্ধভাবেই কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখে অবশ্য কপটচারী দক্ষতায় বলছেন, তাঁরা আলাদা আলাদাভাবেই মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী। তাহলে তাঁরা আসলে কারা?

এঁরা সেইসব ব্যক্তি যাঁরা তাদের বিরোধীদের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পাওয়া জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। এই শ্রেণী সুবিধাভোগী কিন্তু কেবলমাত্র টাকা পয়সাকে ভিত্তি করে হয়েছে তা নয়। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ। এই ইংরাজি মাধ্যম আয়ত্তাধীন থাকায় তাঁরা অনায়াসে বিশ্ব-ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিশেষ সুবিধে পেয়ে যান।

এই সম্পদশালী ঘরের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলে টিফিনে খাওয়ার জন্য 'Hotdog' নিয়ে যেতে অভ্যস্ত যখন আপনি হয়ত জানতেনও না 'হটডগ' বস্তুটা কী? আবার সেই ছেলেটির কথা ভাবুন যে বাবা-মায়ের সঙ্গে Disneyland দেখে এসে তাঁর বর্ণনা দিচ্ছে আর আপনি পরবর্তী জন্মদিনে বাবা কবে 'Appu Ghar' (অবশ্যই দিল্লীবাসী হলে) দেখাতে নিয়ে যাবেন তার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন। এই ছেলে-মেয়েরা যখন বেড়ে উঠল তারা জন্মসূত্রেই অন্য ভারতীয়দের থেকে সুবিধেজনকভাবে কয়েক যোজন এগিয়ে রইল।

ছোট থেকেই এদের সমাজে যোগাযোগ অনেক বেশি রইল। তারা ভালো ইংরেজি বলা ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকার সুবাদে সমাজের আরও উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। গড়পড়তা লোকজনের থেকে উচ্চমার্গে অবস্থান করায় ভালো চাকরি-বাকরি বাগিয়ে নিতেও তাদের সুবিধে হোত। এরই ফলে সমাজে তাদের স্ট্যাটাসও বেড়ে গেল। এই সুবিধেভোগী ছোটোরা বড় হয়ে ঠিক তাদেরই মতো সুবিধেভোগীদের ঠিক চিনে নিতে পারত আর তারা পরস্পরের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়ায় বাড়তি মস্তিতে থাকত।

> **আপনি যদি সত্যিই উদারবাদী ও বুদ্ধিজীবী হন তাহলে বিষয়টাকে কংগ্রেস বনাম বিজেপি'র খেলা বলে অভিহিত করে পাশ কাটিয়ে যাবেন না। সমাধান খুঁজে বের করুন যা আমরা একই সমাজের অঙ্গ হিসেবে কার্যকর করতে পারি— সেটা ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ড হতে পারে যা সব ধর্মীয় বিচারের উর্ধ্বে থাকবে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন পরিকল্পনা যা সকল ভারতবাসীর মঙ্গলমুখী।**

এইবার যেহেতু নিজেদেরকে বিশিষ্ট করে তোলাটা খুবই জরুরি ছিল তাই যে সমস্ত ভারতীয়রা তাদের মতো সুবিধেভোগী

হতে পারেনি তাদের সব কিছুকেই তারা খাটো চোখে দেখতে লাগল। যে যে জিনিস এই আম-ভারতবাসী পছন্দ করত তারা সেগুলিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। যেমন ধরুন, দেশীয় বা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা মানুষেরা অবশ্যই তাদের কাছে নিম্নশ্রেণীর বলে পরিগণিত হবে। আবার কেউ ইংরেজি বললেও যদি গুজরাটি বা বিহারি টানে বলে সেক্ষেত্রেও সে বিপুল বিদ্রুপের পাত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু অন্যপক্ষে যদি কেউ ফরাসি বা ইটালিয়ান ঢঙে ইংরেজি বলে সেক্ষেত্রে তা কিন্তু অত্যন্ত রোমান্টিক ও অপার্থিব মনে হবে।

এঁদের কাছে হিন্দুধর্ম নিম্নশ্রেণীর আচরিত একটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ ধর্ম। কিন্তু যেহেতু ভারতীয়দের মধ্যে একটি শ্রেণী প্রথা বহু আগে থেকেই দৃঢ় প্রোথিত ছিল, এই সুবিধেভোগী শিশুরা তাই তাদের নিজেদের তৈরি নিজস্ব শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে বেশ সুখে বাস করতে লাগল।

কিন্তু হায়! সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে গেল। চাহিদা বাড়ল যথার্থ প্রতিভাবানদের। সুবিধেভোগীদের পাত্তা দেওয়ার লোক কমতে লাগল। যেহেতু মেধা ও প্রতিভার কদর বাড়ল তাই চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে এরাই এগিয়ে গেল। অনেক যোগ্য মানুষের হাতেই টাকা আসতে লাগল। যাদের বেশিরভাগই ওই বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও কিছু এসে গেল না। কেউ সুবিধেভোগীদের আর বাড়তি সুবিধে দিতে প্রস্তুত রইল না।

আরও একটা বিশেষ ব্যাপার হলো এই প্রতিভাবান ছোটোরা কিন্তু মোটেই স্থানীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা বা ধর্মকে অবজ্ঞা করার কথা ভাবল না। এথেকেই সৃষ্টি হলো তুলনামূলকভাবে এক বৃহৎ গর্বিত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নাগরিক শ্রেণী। এরা ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি আনতে বদ্ধপরিকর— তাদের বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় আছে কী নেই তাতে কিছু এল-গেল না।

প্রমাদ গুনলেন সুবিধেভোগীরা। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করলেন। তাঁরা যূথবদ্ধ হলেন যাতে একাত্মা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা যায়। নিজেদের নিজেরাই ভূষিত করলেন 'উদারবাদী' খেতাবে। আরও বললেন, তাঁরাই একই অঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ, সবাইকে নিয়ে চলা (inclusive) সহনশীল গোষ্ঠী। খুব কায়দা করে ভুলে গেলেন তাঁরা কত কদর্যভাবে শ্রেণী-সচেতন। তাঁরা এখন হিন্দু আক্রমণ থেকে ভারতকে বাঁচাতে এককাট্টা হয়েছেন। নজর করলেই দেখবেন কোনো হিন্দু কট্টরপন্থী কিছু করলেই এঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হলো বলে রে রে করে উঠছেন। কিন্তু মুসলমান মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে তাঁদের বাকরোধ দেখা যাচ্ছে। এঁরা কী কপটভাবে আধুনিক ও নিরপেক্ষ বলে নিজেদের জাহির করে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাবেন যখন মুসলমান কট্টরপন্থীরা পুরুষ-মহিলার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। তখন এঁদের কাছ থেকে মুসলমান ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ আসে না। এই উদারবাদীদের আলোচনায় কখনও হিম্মত নিয়ে কেউ বলতে পারে না গোধরায় কী নৃশংসভাবে কামরার মধ্যে যাত্রী বোঝাই থাকলেও মুসলমানরা অকাতরে তাতে আগুন দিয়েছিল। এই উদারবাদীদেরকে অনেকেই যে বিতৃষ্ণাভরে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষী, কপট বুদ্ধিজীবী বা ছদ্ম উদারবাদী বলে থাকেন তারও পর্যাপ্ত যুক্তি রয়েছে। আদতে তাদের যথার্থ উদারবাদী হওয়ার কোনো বাসনাই নেই। তাদের উদ্দেশ্য ওই যারা তাদের মতো বাড়তি সুবিধে পেয়ে বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি তাদের দাবিয়ে, ধর্মকে ছোট করে দেখানো। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী মোদী আর অমিত শাহ যদি দুন স্কুলে পড়তে যেতেন বা বিদেশের কোনো কলেজ থেকে পাশ করে বা না করে আসতেন বা নিদেনপক্ষে ইংরেজিটা উদারবাদীদের কাছে সড়গড় পরিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক উচ্চারণে বলতেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা এতটা অগ্নিশর্মা হয়ত হয়ে উঠতেন না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! আমাদের দেশে কিন্তু বর্তমানে সত্যিকারের উদারবাদী ও বুদ্ধিজীবীর বিশেষ প্রয়োজন। দেশের সেই সব লোককে আজ বড়ই দরকার যাঁরা সত্যিসত্যিই নতুন কোনো ভাবনার অধিকারী এবং সেগুলির সঠিক প্রয়োগও তাঁদের আয়ত্তাধীন। সেইসব মানুষকেই আসতে হবে যারা বাস্তবে সকল শ্রেণীর ভারতীয়কে একসঙ্গে নিয়ে ভাবতে পারেন। শুধুমাত্র মোদীকে ঘৃণা করলেই কোনো সমস্যার সমাধান হবে না।

আর হতভাগ্য সুবিধে থেকে বঞ্চিতদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খাটো করে দেখলেও কিছুই হবার নয়। পরিবর্তে এমন কিছু রাস্তার কথা বলুন যাতে সত্যিই ভারতীয় সমাজে সদর্থক পরিবর্তন আসে। তাই বলছি, আপনি যদি সত্যিই উদারবাদী ও বুদ্ধিজীবী হন তাহলে বিষয়টাকে কংগ্রেস বনাম বিজেপি'র খেলা বলে অভিহিত করে পাশ কাটিয়ে যাবেন না। সমাধান খুঁজে বের করুন যা আমরা একই সমাজের অঙ্গ হিসেবে কার্যকর করতে পারি— সেটা ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ড হতে পারে যা সব ধর্মীয় বিচারের ঊর্ধ্বে থাকবে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন পরিকল্পনা যা সকল ভারতবাসীর মঙ্গলমুখী। সকলের জন্য ইংরেজি শিক্ষা বা সকলের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।

এই কাজকর্মের জন্য রাজনীতিবিদদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে হবে না। তাঁদের নিজেদের দোকান চালাতে হবে। ভোট ব্যাঙ্কের থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে অন্য কিছু নয়। তাই সমগ্র নাগরিক সমাজের উদারবাদী ও বুদ্ধিজীবীরা মিলে যদি সংস্কারের ক্ষেত্রে সহমতের ভিত্তিতে কোনো যৌথ সিদ্ধান্ত নেন সেক্ষেত্রে রাজনীতিকরা তা মানতে বাধ্য হবেন। যদি সত্যিই আপনি উদারবাদী হতে চান সেক্ষেত্রে সর্বদাই সমাধানমুখী হবেন। যথার্থ খোলা মনের অধিকারী হওয়া ও অভিজাত ভাবধারার (elitist) বিরোধী হওয়া আপনার আবশ্যিক শর্ত। তবে কোনো চায়না কাপ থেকে সুগন্ধি চা খেতে খেতে এ ভাবনা মাথায় নেবেন কিনা তা আপনার একান্ত নিজস্ব।

*(লেখক ও সংবাদ ভাষ্যকর,*
*সৌজন্যে : টি ও আই)*

# শরণার্থীদের প্রতি অভয়বাণী প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে ২০১৪ সালের মধ্যে যেসব হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ধর্মীয় শরণার্থী হিসেবে এদেশে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হবে। বিগত লোকসভা (২০১৪) নির্বাচনের প্রচারে এ রাজ্যে এসে মোদী এমনই ঘোষণা করেছিলেন। এবার তিনি তাঁর সেই কথা রাখলেন। অথচ সেই নির্বাচনী প্রচারে মোদীর বক্তব্যকে একশ্রেণীর সাংবাদিক বিকৃত করে বা ভুল ভাবে প্রচার করেছেন। মোদীজী বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারীরা পুঁটলি-পোটলা নিয়ে তৈরি থাকো। তোমাদের এদেশ ছাড়তে হবে। তোমাদের এদেশে ঠাঁই হবে না। আসলে তিনি 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে মুসলমানদেরই বোঝাতে চেয়েছেন— যারা বিনা কারণে এদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। কিন্তু ধর্ম-সংস্কৃতির কারণে যেসব হিন্দু বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে বা বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, তারা যে শরণার্থী তা তিনি তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কারও করেছেন। তবে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' অধিকাংশ সাংবাদিক অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীর মধ্যে কোনো লক্ষ্মণরেখা না টেনে সবাইকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে শরণার্থীরা হয়েছেন বিভ্রান্ত, শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। উপরন্তু অবিজেপি দলগুলি পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে শরণার্থীদের বুঝিয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তোমাদের এদেশ ছাড়তে হবে। কারণ মোদী তোমাদের অনুপ্রবেশকারী বলছেন। তাই বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। কাজেই শরণার্থীদের আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক।

'৭১-এর পর যেসব হিন্দু এদেশে এসেছে পদে পদে তারা এদেশেরই একশ্রেণীর দুষ্টচক্র দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে।

## চিঠিপত্র

অনুপ্রবেশকারীর ভয় দেখিয়ে অনেকের কাছ থেকেই টাকা হাতিয়েছে তারা। নিজেদের রক্ষা করতে তাই তাদের নিতে হয়েছে শাসকদলের আশ্রয়। কাউকে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে। কারও বা জমি-ঘর দখল হয়ে গিয়েছে। আমার জানা একটি ঘটনা— এক শরণার্থীর জমিতে রাতারাতি শাসকদলের পার্টি অফিস নির্মিত হয়। জমির মালিক জমি দাবি করলে তাকে দেখানো হয় পুলিশের ভয়। এমনকী আইন, আদালত, জেল, হাজতবাস ইত্যাদিরও ভয়। সেই ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই বলছি, দস্যুর দল শুধু বাংলাদেশেই নেই, এদেশেও আছে।

এতকাল শরণার্থীরা কংগ্রেস, তৃণমূল, কমিউনিস্ট প্রভৃতি দলের বিভ্রান্তমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা তাদের ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু মোদী সরকারের ঘোষণা নিশ্চয়ই তাদের সেই বিভ্রান্তি দূর করবে। তাঁরা অবশ্যই বিজেপি-র দিকে ঝুঁকবেন। মোদীর হাতকে শক্ত করবেন। তাঁদের মনে রাখা উচিত, যতদিন মোদী ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন তাঁরাও নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বা সেকুলারিস্টরা ক্ষমতায় এলে তাঁদের শরণার্থীর সুযোগ আবার কেড়ে নিতে পারে। কারণ হিন্দুবিদ্বেষী, শরণার্থী বিরোধী ওইসব দল শরণার্থীদের স্বীকার করে না। তাদের কাছে শরণার্থীরা অনুপ্রবেশকারীই। তাই নরেন্দ্র মোদীর সরকারের প্রতি শরণার্থীদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

**—ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

# বুদ্ধিজীবীদের কিছু প্রশ্ন

বিগত কয়েকদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাদের সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। এইভাবে পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া সত্যিই প্রতিবাদের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায় যার উত্তর এইসব বুদ্ধিজীবীদের থেকে পেলে খুব ভালো হয়।

প্রথমত, পদ্ধতি মেনে অর্থসহ পুরস্কার কতজন ফিরিয়েছেন?

দ্বিতীয়ত, এই বুদ্ধিজীবীদের কি জানা আছে যে পাকিস্তানে লতার গান শুনতে দেওয়া হয় না!

তৃতীয়ত, আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার চলছে এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে। এই নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা কি প্রতিবাদ করেছেন?

চতুর্থত, তসলিমা নাসরিন যে নিজের দেশেই যেতে পারছেন না, এমনকী কলকাতাও তার স্থান হচ্ছে না সেই নিয়ে তাঁরা কী ভাবছেন?

পঞ্চমত, কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিজভূমে পরবাসী সেই নিয়ে তাদের কী ভাবনা।

ষষ্ঠত, পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে সাধারণ মানুষের ওপর দমন পীড়ন নিয়ে তাঁরা কী ভাবেন?

এই হাফ ডজন প্রশ্ন ছাড়াও বহু প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যা লিখতে গেলে একটি বই রচনা সম্ভব। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেলে খুব সন্তুষ্ট হবো।

**—রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

# হিন্দুত্ববাদীরা কি ভীরু নাকি উদাসীন?

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যায় লেখক মহোদয় যে হিন্দুত্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত জেনে ভাল লাগল। তবে প্রথমেই তিনি স্ববিরোধী কথা বলেছেন--- ''এই উক্তি বিষয়ে

হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারিনি। এদের পক্ষ থেকে বক্তাকেই সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।'' যদিও তিনি উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, হিন্দুত্ববাদী বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন খোলাখুলি লিখলে আরও ভাল হোত।

গত ১০ তারিখ 'স্বস্তিকা' পূজা সংখ্যার আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে লেখিকা এষা দে অকপটে স্বীকার করেছেন স্বস্তিকায় মনের কথা লেখা যায়। কোনোরকম বাধ্যবাধকতা থাকে না। মনে হয় তার জন্যই বারবার 'হিন্দুত্ববাদীরা' শব্দটা বিশেষভাবে খোঁচা দেওয়ার জন্যই শ্রীরায় ব্যবহার করেছেন।

**—হরিসাধন কোঙার,**
কর্মকুঞ্জ, অসম।

# নারীর নিরাপত্তা

সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি বলেছেন হিন্দুদের ঘরে চারটি করে সন্তানের কথা। অতএব, সেকুলার ধর্মালম্বীরা ও তামাম মিডিয়া রে রে করে মাঠে নেমে পড়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা খুঁজতে ব্যস্ত। এরা একবারও ভেবে দেখছেন না কেন একজন সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসিনী আজও একথা বলেছেন— বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠনও উচ্চস্বরে নারীর অধিকার হরণ হচ্ছে, নারীর উপর অত্যাচার হচ্ছে ও নারী কি সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ইত্যাদি বক্তব্য রেখে তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এরা কি প্রকৃতই নারীর অধিকার নিয়ে চিন্তিত, নারীর উপর অত্যাচার নিয়ে আন্তরিক ভাবে ব্যথিত? ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমান নারীর করুণ অবস্থা। এবং এনিয়ে এই সমস্ত নারীবাদী সংগঠন, সেকুলারবাদী ও তামাম মিডিয়ার কোনো প্রকার মাথাব্যথাই নেই। আর এর পিছনেও এদের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একদিকে অর্থের মোহ এবং তার জন্য মুসলমান মোল্লা মৌলবিদের সন্তুষ্ট রাখা। এবং আর একদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্লজ্জ দালালি করা।

সনাতন হিন্দুধর্মে নারীকে মাতারূপে পুজো করা হয়। বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে নারীর রূপ মা-কালী, মা-দুর্গা, মা-লক্ষ্মী, মা-সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পুজো করা হয়। এছাড়া আমরা ভারতবর্ষে কুমারী মেয়ের পুজোর প্রচলন প্রত্যক্ষ করে থাকি। একজন প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে চলা ভারতীয় নারীর উপর অত্যাচারের কল্পনা করাও পাপ। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতবর্ষে বর্তমানে বহু হিন্দু পরিবারেই মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এবং তা হচ্ছে কেন? আমাদের এই ইতিহাস বিস্মৃত হলে হবে না যে ভারতবর্ষ প্রায় ১০০০ বছর যাবৎ বিধর্মী মুসলমান ও খৃষ্টানদের দ্বারা পরাধীন ছিল। আর মুসলমান আক্রমণ থেকেই ভারতবর্ষে নারীর উপর অকথ্য অত্যাচারের সূচনা হয় এবং তা এতটাই বীভৎস ছিল যে, নারী তার সতীত্ব বাঁচানোর জন্য অগ্নিতে বা কুঁয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন। অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতকে ইসলামিকরণের যে গোপন এজেন্ডা নিয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানরা চলছে, তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি ওই কথা বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির পালনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে।

**—প্রদীপ লাহা,**
নিমতলা, হরিণঘাটা, নদীয়া।

# অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

স্বস্তিকা পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। বিশেষ করে পৌরাণিক কাহিনিগুলি আমাকে আকর্ষণ করে। আমার মনে হয়, যে সকল পরিবারে দাদু-ঠাকুরমারা ছোটদের পৌরাণিক কাহিনি শেখাতে পারেনি বা বড় হয়ে স্মৃতিভ্রম ঘটেছে তা নতুন করে জানবার ও আর একবার ঝালিয়ে নেবার জন্য স্বস্তিকা অবশ্যই পড়া দরকার।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় নবাঙ্কুর বিভাগে মনীষী কথায় 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত হয়েছে— ''সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে ধর্মরক্ষিত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর ২৯ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পরিচিত হন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে।''

বৌদ্ধ আচার্যের সঠিক নাম নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠা-২৫৯-তে বলেছেন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রথমে জেতারি ও পরে রাহুল গুপ্তের নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে বৌদ্ধ সঙ্ঘের আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু তাঁকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধিতে ভূষিত করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের গোড়ায় রাজা 'য়ে-শেষ-হোড' তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে দূত পাঠান। শ্রীজ্ঞান অ-মনস্ত হলে দূত উপহারসহ ফিরে আসেন। রাজা 'য়ে-শেষ-হোড' কারাগারে বন্দী অবস্থায় পুনরায় শ্রীজ্ঞানকে নিজদেশে আগমনের জন্য পত্রপ্রেরণ করেন। শ্রীজ্ঞান ৬০ বছর বয়সে নেপাল ও হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিবাহিত করে তিব্বত যান। তিব্বতের মানুষ এই মহাজ্ঞানীকে 'অতীশ' নামে সম্মানিত করেন। তিনি হয়েছেন 'অতীশ শ্রীজ্ঞান।'

আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ□ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান□ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সংক্ষিপ্ত জায়গায় তথ্যটি এরূপ পরিবেশিত হলে আরো ভাল হোত।

**—দীপঙ্কর রানা,**
ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওয়া।


**ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র**

**প্রণব**

**পড়ুন ও পড়ান**

# প্রসঙ্গ জগদ্ধাত্রী পুজো

**নবকুমার ভট্টাচার্য**

শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রায় একমাস পরে অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় বর্তমান বাংলায় নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭২৮ থেকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারও পূর্বে সমগ্র বাংলার ধর্মব্যবস্থাপক ছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্বের' কথা উল্লেখ রয়েছে। রঘুনন্দনেরও পূর্বে লেখা মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'ব্রতকথা ও ব্রতকাল বিবেক' গ্রন্থে দেবী জগদ্ধাত্রীর পুজোর বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ কাত্যায়নীতন্ত্রে দেবী জগদ্ধাত্রীর উৎপত্তির বিবরণ রয়েছে। জগদ্ধাত্রী পুজো প্রাচীন হলেও কালক্রমে এই পুজো লুপ্ত হয়েছিল। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে আবার এই পুজোর প্রচলন শুরু হয়।

১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনা। মিরকাশিম তখন বাংলার নবাব। সেই সময় চক্রান্ত করে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করে মুঙ্গের দুর্গে আটকে রাখা হয়। সঙ্গে রাজপুত্র শিবচন্দ্রকেও। ইতিমধ্যে সেই সময় মাঝে মাঝেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে মিরকাশিম ইংরেজদের ভয়ে মুঙ্গের ছেড়ে চলে যান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে গেলেন। তখন আশ্বিন মাস দুর্গাপুজোর সময়। নবাবের হাত থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পেলেন বটে। কিন্তু তখন শারদীয়া দুর্গাপুজো হয়ে গিয়েছে। মুক্তি পেয়ে মহারাজ জলপথে নৌকায় বাংলায় ফিরে আসছেন, কিন্তু মনে তাঁর এতটুকুও শান্তি নেই। এমনকী আহারনিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছেন। মহারাজের মনে কেবল একই চিন্তা এবার আর তাঁর দুর্গা পুজো করা হলো না। নদীর ঘাটে ঘাটে বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝলেন, দুর্গাপুজো হয়ে গেল। ক্ষোভে দুঃখে দুর্বল শরীরে মহারাজ হতাশ হয়ে নৌকার মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই রাতে মহারাজ স্বপ্নে দেখলেন সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা রক্তাম্বুজা এক অপূর্ব দেবীমূর্তিকে। ওই দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে যেন বললেন— এ বছর দুর্গাপুজো করতে পারেনি বলে দুঃখ করো না। আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে আমার এই মূর্তি গড়িয়ে একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো সম্পন্ন করলে দুর্গা পুজোরই সমফল পাওয়া যাবে।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে মহারাজের মনটা বেশ প্রফুল্ল হলো। কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেই তিনি স্বপ্নাদেশ মতো সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি গড়িয়ে শুক্লানবমী তিথিতে মহাধূমধামের সঙ্গে পুজো করলেন। সেই থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সৃষ্টি বা সর্বপ্রথম প্রচলন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে নদীয়ার সর্বত্র পরে হুগলীর চন্দননগরে আরম্ভ হয়। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা করেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল গভীর। এই ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন ফরাসীদের দেওয়ান। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে। ইন্দ্রনারায়ণ মহারাজের গৃহে এসে জগদ্ধাত্রী মূর্তি দেখে আহ্লাদিত হন এবং তারপর চন্দননগরে ফিরে এসে অনুরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি তৈরি করে পুজোর প্রচলন করেন। সেই থেকে শুরু চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পুজোটাই হলো চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের চাউলপট্টি বা লিচুপট্টির পুজো। এখনও তাই চাউলপট্টির এই পুজোতে পুজোর সঙ্কল্প হয় ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর নামে। পুজোর প্রথম বলিটাও যায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বর্তমান বংশধরের বাড়িতে। কিন্তু চন্দননগরের তখনকার পুজো ও বর্তমান পুজোর মধ্যে বিস্তর ফারাক।

কৃষ্ণচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণ একদিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো করলেও বর্তমানে তিন দিন ধরে এই পুজো হচ্ছে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দুটি কল্প। তার মধ্যে প্রথম কল্প কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে তিন পুজো এবং দশমীতে বিসর্জন। নিগমকল্পসার ও জ্ঞানসারস্বত গ্রন্থে প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে—

'অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব পরমেশ্বর
সপ্তম্যাদি নবম্যন্তং পূজাকালমিতীরিতম্
ত্রিদিনে ত্রিবিধা পূজা দশম্যাঞ্চ বিসর্জয়েৎ।'

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একমাত্র নবমীতে যে পুজো করা হয় তা দ্বিতীয় কল্প। কুব্জিকা তন্ত্রে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু নবস্যাং জগদম্বিকাম্
দুর্গাং প্রপূজয়েদ্ভক্ত্যা ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।'

অর্থাৎ ধর্ম অর্থ ও কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমীতে জগন্মাতা দুর্গার পুজো করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে তিন পুজো করতে না পারলে একমাত্র নবমীতে জগদ্ধাত্রী পুজো করবে।

যেদিনে নবমী তিথি পূর্বাহ্নের মুহূর্তব্যাপিনী হবে সেই দিনে পূর্বাহ্ন মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে জগদ্ধাত্রীর পুজো হবে। কেবল নবমী পুজো করলে পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নরূপ তিনকালে তিনটি পুজো করতে হবে। জগদ্ধাত্রীর পুজোয় সঙ্কল্প ও দক্ষিণার বাক্যে সৌরমাস উল্লেখ করতে হবে। আর জগদ্ধাত্রী পুজো অগ্রহায়ণ মাসে হলেও সঙ্কল্পবাক্যে কার্তিক মাস উল্লেখ করতে হবে।

দুর্গাপুজো কার্তিক মাসে পড়লে সঙ্কল্প বাক্যে যেমন আশ্বিন মাস উল্লেখ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ বিধিবাক্য উল্লেখ্য।

জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলেন মা সারদা। সারদামণির জগদ্ধাত্রী পুজোর কাহিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেদিন ছিল জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। বালিকা সারদা জগদ্ধাত্রীর সামনে চোখ বুজে বসে রয়েছেন। রামহৃদয় ঘোষাল এসেছেন পুজো করবেন বলে। ঘোষালমশাই বুঝতে পারলেন না কোনটি জগদ্ধাত্রী মূর্তি। পরদিন শ্যামাসুন্দরী শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁ রে সারদা, লাল রং পায়ে বসে ছিল, ও কী ঠাকুর? শ্রীমা বললেন জগদ্ধাত্রী।

১২৯৮ সালের ২৫ কার্তিক জগদ্ধাত্রী পুজো হয়েছিল। মা তখন পূর্ণমাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং সারদা মায়ের দেবীত্ব তখন প্রচার লাভ করেছে। মা জগদ্ধাত্রীপুজো করবেন শুনে ভক্তেরা চললেন নানান আয়োজন-সহ মায়ের বাড়ি। মার সে কী আনন্দ। কীভাবে ছেলেদের যত্ন করবেন সে চিন্তায় তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। মায়ের বাপের বাড়ির নিয়ম অনুসারে জগদ্ধাত্রী পুজো তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হোত সেবারের পুজোও তেমনি হয়েছিল। মা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সন্ধ্যারতি বা পুজোর সময় মা জোড় হাতে প্রতিমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন অথবা চামর দিয়ে বাতাস করতেন। বহু দূর হতে ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করতে আসতেন। সকলেই দেশের রীতি অনুসারে ভাত, ডাল, তরিতরকারি, মাছ দই খেয়ে তৃপ্তি সহকারে বিদায় নিত।

সেবার পুজোয় একটা অন্য ঘটনাও ঘটেছিল। তিন দিন পর শ্রীরামপুর থেকে যারা এসেছিল তারা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। মার চিন্তার অবধি নেই। কাজ করতে করতে অবকাশ পেলেই তিনি এসে ছেলেদের দেখে যাচ্ছেন। গাঁয়ে দুধ মেলে না, তবুও বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেটুকু পেলেন যোগাড় করলেন ছেলেদের জন্য। মায়ের সেবা ও পথ্যি পেয়ে সকলেই সুস্থ হয়ে উঠল এবং বাড়ি ফিরে যেতে চাইলেন। মার ভীষণ কষ্ট, ভক্তেরা চলে যাচ্ছে। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে মার সে কী কান্না। মায়ের কান্না দেখে যোগীন মা, গোলাপমাও কাঁদলেন। ভক্তদের চোখেও জল। মা বলছেন আবার এসো! সারদা মায়ের অটল সঙ্কল্পে জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দিরে এখনও জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। সারদা মা পুজো যাতে ঠিকমতো হয় তার জন্য ১৮৯৪ সালে দশ বিঘা জমি জগদ্ধাত্রীর নামে দেবোত্তর করে দিয়েছেন। এখনও পুজো মায়ের নামেই সঙ্কল্প করা হয়। দেবী জগদ্ধাত্রী সিংহের ওপর অধিষ্ঠিত। সঙ্গে রয়েছে করিন্দ্রাসুর। দেবীর দুপাশে দুই সখী জয়া আর বিজয়া। আর থাকেন নারদ মুনি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো? যিনি জগৎ ধারণ করে আছেন তিনি না ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়।' মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজো ও মেলা বিখ্যাত। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'উৎসব মেলার ইতিহাস' গ্রন্থে কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজো ও মেলা উৎসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত লিখেছেন। মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত কাগ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজো আজ প্রকৃতই উৎসবে পরিণত হয়েছে। ▮

## আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়— একটি বৈদিক আবেদন

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বীরভূমের শান্তিনিকেতনের পাশেই ৩০ বিঘা জায়গার উপর একটি বাংলা মাধ্যম ও একটি ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ও একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই কাজ শেষ করতে এখনও ৮৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সকল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, প্রত্যেকেই যদি নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করেন তবে এই কাজ সহজেই হতে পারে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শান্তিনিকেতন শাখার ১০৫৯৮৫৪৪০৬৯ -এই এ্যাকাউন্ট নম্বরে যে কোনো অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গা থেকে ফোন করলে আমরা ব্যক্তিগতভাবেও সংগ্রহ করতে পারি।

এছাড়াও কেউ যদি তার পরলোকগত বাবা, মা, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিতে একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে দেন তবে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। এর জন্য খরচ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা।

এছাড়াও স্কুলে ব্যবহার করা যাবে এমন পুরনো অথবা নতুন আসবাবপত্র, বই অথবা যে কোনো জিনিস কেউ দান করেন তবে তাও সাদরে গৃহীত হবে।

সকল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সহযোগিতা কাম্য।

বিনীত,
সম্পাদক
আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন
মোবাইল : ৯১৫৩২৬০১৬০

# জগদ্ধাত্রী পূজা ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

**সপ্তর্ষি ঘোষ**

দুশো সাইত্রিশ বছর আগের কথা। সেই সময় চক্রান্ত করে নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দি করে মুঙ্গের দুর্গে আটক রাখা হয়। তখন আশ্বিন মাস। দুর্গা পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি অবস্থায় বিষণ্ণ মনে মুক্তির জন্য মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। আর বার বার ভাবেন, আমি কি এবার মায়ের পুজো করতে পারব না? আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু পুজোর চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। অবশেষে মহারাজা মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু দুর্গোৎসব তখন সমাপ্ত। জলপথে বাড়ি ফেরার সময় তিনি বিসর্জনের বাজনা শুনে নৌকোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন নদীর ঘাটে ঘাটে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে মনের দুঃখে তিনি নৌকোর মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা এক অনুপম জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে বললেন— এই বছর দুর্গাপূজা করতে পারনি বলে দুঃখ পেও না। যে মূর্তিতে আমাকে দেখলে সেই মূর্তি গড়িয়ে আগামী শুক্লা নবমীতে একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা সম্পন্ন করলে দুর্গাপূজার ফল পাবে। আর এই পূজা তুমিই প্রচার করবে।

এই স্বপ্ন দেখার পর কৃষ্ণচন্দ্রের মূর্ছাঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন এবং জল পান করে স্বাভাবিক হলেন। এরপর শান্ত মনে কৃষ্ণনগরে নিজ বাড়িতে ফিরে এলেন। মহারাজ কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পৌঁছেই দরবার কক্ষে পণ্ডিতদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন এবং স্বপ্নের কথা তাঁদের জ্ঞাত করলেন। তখনই কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পীদের খবর দেওয়া হলো মহারাজা স্বপ্নে দেখা মূর্তির কথা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন। মৃৎশিল্পী তদনুযায়ী প্রতিমা গড়ে তোলে। স্বপ্নাদেশ মতো কৃষ্ণচন্দ্র শুক্লা নবমী তিথিতে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা সমাপন করলেন। সেই থেকেই জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু। এই দেবী মূর্তিই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বলে সর্বত্র পরিচিত ও পূজিতা। এই জগদ্ধাত্রী পুজো আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে। আগের মতো সেই জৌলুস নেই, আড়ম্বর নেই। কিন্তু আছে ঐতিহ্য এবং নিয়মনিষ্ঠা। জগদ্ধাত্রী পুজোর সর্বপ্রথম প্রচলন নদীয়ার কৃষ্ণনগরেই হয়েছিল। এর অনেক পরে হুগলীর চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। চন্দননগরে অবশ্য দুর্গাপুজোর মতো চারদিন ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। দুর্গাপুজোর ঠিক একমাস পরে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো আজ এক সর্বজনীন উৎসবের রূপ নিয়েছে। এই পুজো কৃষ্ণনগরের একান্ত নিজস্ব উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশাল বিশাল প্রতিমা শোলার সাজে ও ডাকের সুসজ্জিতা। এক দিনেই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজো হয় এবং পরের দিন দশমী পূজা হওয়ার পরে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। এই রীতিই চলে আসছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে। কৃষ্ণনগরের সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঢাকের বাজনা। কোন পাড়া কতগুলো ঢাক আনতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে।

*(ছবিটি বুড়িমা, চাষাপাড়া বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা, কৃষ্ণনগর।)*


সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

# ‘চাই না মাগো রাজা হতে’

কয়েকশো বছর আগের কথা। এখনকার কোচবিহার জেলা ও অসমের কিছু অংশ নিয়ে ছিল কামরূপ রাজ্য। সেখানকার রাজা ছিলেন বিশ্বসিংহ। তিনি অনেক পরিশ্রম করে কামরূপ রাজ্য গঠন করেন। বিশ্বসিংহ মারা যাবার পর সেখানকার রাজা হন তাঁর ছেলে নরনারায়ণ। সেনাপতি হন তাঁরই আর এক ছেলে শুক্লধ্বজ। যিনি চিলারায় নামে পরিচিত। অনেক বড়ো বীর ছিলেন রাজা নরনারায়ণ। তাঁর থেকেও বড়ো বীর ছিলেন সেনাপতি চিলারায়। চিলের মতো ছোঁ মেরে যুদ্ধ করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল চিলারায়। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ করে তার আবির্ভাব হোত। যুদ্ধ করে আবার হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যেতেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন— যোদ্ধা হিসেবে তিনি শিবাজীর তুল্য। কিন্তু এতো বড়ো বীর হওয়া সত্ত্বেও চিলারায় কোনোদিন রাজা হননি। সেনাপতি হয়েই সারাজীবন রাজ্যের সেবা করে গেছেন।

শোনা যায় চিলারায়ের এই ব্রত গ্রহণের কারণ রাজ কুলদেবীর মহিমা। কামরূপ রাজ্যের কুলদেবী হলেন দেবী দুর্গা। যিনি বড়োদেবী নামে পরিচিত। রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এই দেবীরও প্রতিষ্ঠা হয়। খুব জাগ্রত দেবী। রাজাপ্রসাদের কাছেই দেবীর মন্দির। চিলারায়ের কাছে দেবী মহিমা প্রকাশ পায় নরনারায়ণ রাজা হওয়ার পর। নরনারায়ণ ছিলেন বিশ্বসিংহের বড়ো ছেলে। আর চিলারায় ছিলেন তৃতীয়। স্বাভাবিকভাবে নরনারায়ণই রাজা হন। কিন্তু চিলারায় তা মেনে নিতে পারেননি। চিলারায় যেহেতু নরনারায়ণের থেকে বড়ো যোদ্ধা ছিলেন তাই তিনি নিজেকে রাজা হিসেবে যোগ্য মনে করতেন।

রাজা হতে না পেরে চিলারায় মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট। তখন এক ফন্দি আঁটলেন তিনি। নরনারায়ণকে যদি কোনোমতে মেরে ফেলা যায় তাহলে রাজা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। সেই মতো চিলারায় একদিন গভীর রাতে রাজা নরনারায়ণের শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। হাতে ধারালো তরবারি। চকচক করছে। নরনারায়ণ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চিলারায় নিঃশব্দে দরজা খুলে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক আঘাতেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু একি দৃশ্য! এ যে নরনারায়ণ নয়, পালঙ্কে শুয়ে আছেন বড়োদেবী। তার মুখের উজ্জ্বল আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। চিলারায় দৌড়ে ঘর থকে বেরিয়ে এলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে ভাবলেন মনের ভুল। তরবারি নিয়ে আবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এবার তিনি তৈরি, কোনো কিছু না ভেবেই নরনারায়ণের মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখলেন নরনারায়ণের মুণ্ড কোথায়, এ যে দেবীর মুখ!

এই দৃশ্য দেখে চিলারায় তাঁর তরবারি ছুড়ে ফেলে দিলেন। ঘুম ভেঙে গেল নরনারায়ণের। চিলারায় তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন তিনি। নিজের দাদাকে মারতে গিয়ে তিনি কত বড়ো ভুল করেছেন, তা বুঝতে পারলেন। তারপরেই তিনি রাজা হওয়ার বাসনা ত্যাগ করেন। সেনাপতি হয়ে সারাজীবন রাজ্যের সেবা করবেন এই ব্রত গ্রহণ করেন। সেনাপতি হয়ে তিনি নরনারায়ণের রাজ্য রক্ষা করতে থাকেন। রাজা না হয়েও যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি জগৎজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

*বিরাজ নারায়ণ রায়।*

## রাজ্য পরিচিতি

### কেরল

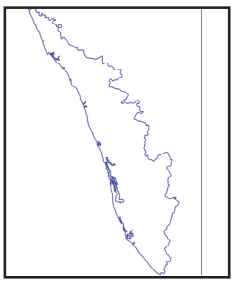



কেরল রাজ্য ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে নারিকেল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং অস্তাচলগামী সূর্যের দৃশ্য খুবই মনোরম। রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৭ জন। আয়তন ৩৮ হাজার ৮৬৩ বর্গ কিলোমিটার। ভাষা মালয়ালাম। কাজু, সুপারি, নারিকেল, গোলমরিচ, এলাচ, কফি, চা প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদের মধ্যে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট, গ্রাফাইট, লাইমেনাইট, মোনেজাইটের অনেক খনি আছে। ঐতিহাসিক বন্দর কালিকট। যার বর্তমান নাম কোঝিকোড়। নববর্ষ শুরু হয় ওনাম উৎসব থেকে। কথাকলি ও মোহিনী-অট্টম প্রধান নৃত্য। তিরুঅনন্তপুরুম্, ওয়র্ক্কলা, মলমপুঝা, কোওলম্, পদ্মনাভস্বামী ও গুরুভায়ুর মন্দির দর্শনীয় স্থান।

আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান এই রাজ্যের কালাডি গ্রামে। কেরালার কুড়িয়াট্টম্ (বাইচ প্রতিযোগিতা) দেশবিদেশের পর্যটকদের আকর্ষিত করে। থুম্বা এ রাজ্যের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র।

## প্রশ্নবাণ

১. পুরাণ কটি ও কে রচনা করেন?

২. আরুণির গুরু কে?

৩. শিখণ্ডীর আগের নাম কি?

৪. ঘটোৎকচের বাবা কে?

৫. গান্ধারী কোথাকার রাজকন্যা?

উত্তর : ১. আঠারো, বেদব্যাস।
২. ধৌম্যমুনি। ৩. অম্বা। ৪. ভীম।
৫. গান্ধার (কান্দাহার)।

## ছবিতে অমিল খোঁজ

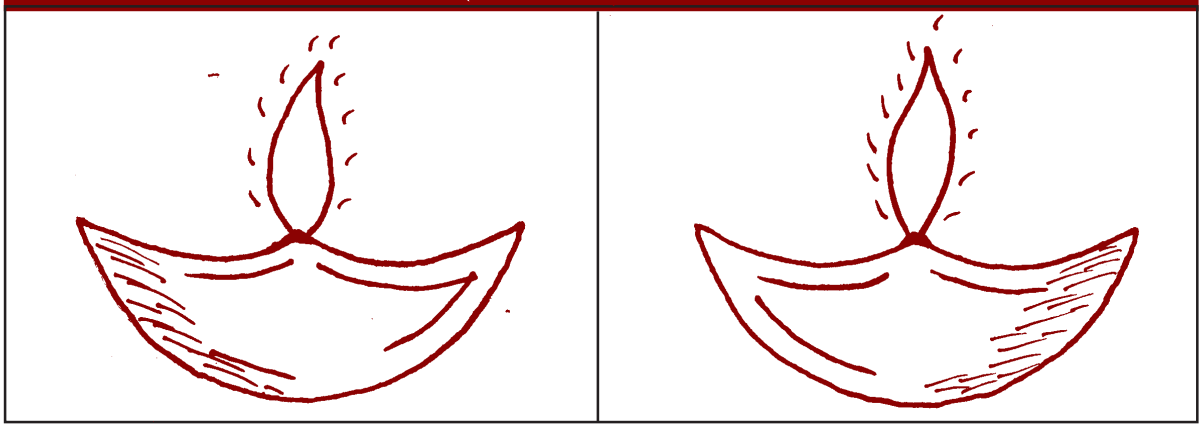



## ছোটদের কলমে

### মায়ের ভাসান

**অনুভব বেরা,** প্রভাত শ্রেণী

মাগো তুমি কোথায় গেলে
আমি দেখতে যে না পাই,
পাখির মত উড়ছো তুমি
রোজ আকাশের গায়।
নদীর জলে, ঢেউয়ের সাথে
যাচ্ছ তুমি ভেসে ভেসে
দূরের ওই নৌকাগুলির গায়,
মাগো তোমায় দেখতে যে না পাই।।

*এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও*

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

*মেল করা যেতে পারে।*

অঙ্গনা

# মহিলাদের মধ্যে এসেছে ‘হিম্মত’

**সুতপা বসাক ভড়**

মহিলাদের সুরক্ষার অভাব পুরো সমাজে, দেশে, বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, বিজ্ঞাপন, আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেয়েদের পণ্য হিসেবে পরিবেশন করা এবং ওই ধরনের প্রতিযোগিতা আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্তরে আয়োজন করে মেয়েদের মানুষ থেকে বেশি ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখানো হচ্ছে। এই পরিবেশন আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। মেয়েদের আমরা স্বভাবত ‘মা’ হিসেবেই ভাবতে এবং ডাকতে পছন্দ করি। নিজের মা, মেয়ে থেকে শুরু করে পথ চলতে নাম-না-জানা সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়েকেও আমরা অনায়াসে ‘মা’ বলতে পারি। কর্তামা, ঠাকুমা, দিদিমা, জেঠিমা, কাকিমা, মামিমা, মাসিমা, বৌমা ইত্যাদিতে আমরা ‘মা’-কেই বার বার ডাকি। মন্দিরে যেতে হলে বলি মা’র বাড়ি যাচ্ছি। তাহলে সেই মায়েদের সঙ্গে যে ধরণের দুর্ব্যবহার বেড়ে চলেছে— তা আমরা সহ্য করি কীভাবে? এইসব কুপ্রবৃত্তির শিকার এক বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধাও



হচ্ছেন। এর প্রতিকারের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের কথা উঠছে বারবার। সামাজিকভাবে অভিযুক্ত এবং তার পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই চরম শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন, কিন্তু তাতে ওই অভাগিনী কি শান্তি পাবে? আধুনিকতার নামে সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে, তার থেকে সমাজকে মুক্ত করার দায়িত্ব কিন্তু কারুর একার নয়— আমাদের সবার। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের অধ্যাত্মবোধ ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মিলন ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যে অসভ্যতা সমাজে এসেছে, তার সংশোধন করতে হলে স্বামীজীর কথাকে পালন করতে হবে।

পুরুষ এবং নারী উভয়কেই জানতে হবে যে, উত্তেজক পোশাক পরা আমাদের সংস্কৃতিতে নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে যেমন নম্র, ভদ্র, দৃঢ়চেতা, স্বাবলম্বী মহিলাদের পাই, তেমনি আমাদের দেশের পুরুষেরাও তো পারম্পরিকভাবে সংস্কারিত, ধর্মাচারী এবং দায়িত্বশীল। দীর্ঘদিন ধরে তারা পরিবার তথা সমাজের মেয়েদের রক্ষার দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে এসেছে। রাখিবন্ধনের মূল উৎসই হলো বোনের রক্ষা। এই উৎসব আমাদের নিজস্ব। এই উৎসবকে সামাজিকভাবে পালন করলে সমাজে ছেলেদের মধ্যে মেয়েদের প্রতি যে পণ্যতুল্য মানসিকতা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে— তার পরিবর্তন হতে বাধ্য।

দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র, কার্যক্ষেত্রে, রাস্তার ধারে নিয়মিত বিজ্ঞাপন থাকা প্রয়োজন যে মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের সবার কর্তব্য। এজন্য ওই বিজ্ঞাপনগুলি সর্বসমক্ষে থাকা খুবই জরুরি যা আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে, আমরা মানুষ— অমৃতের সন্তান! সরকার, সামাজিক সংগঠন, আইন, পুলিশ সব বিভাগকেই এই ধরনের বিজ্ঞাপণ দিতে হবে। ফলস্বরূপ, সবার মধ্যে দায়িত্ববোধ আসবে। আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের নিজেদেরও এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের কাছে রাখা লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়োর বস্ত্র, সেফটিপিন ইত্যাদি আক্রমণকারীকে প্রতিহত এবং প্রতিঘাত করতে খুবই কার্যকরী হয়। এছাড়া মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে জুডো ক্যারাটে শেখা দরকার। বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝে মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের একটি পদক্ষেপ খুবই অভিনন্দনযোগ্য। কেন্দ্র সরকার পুরো দেশে মহিলাদের মধ্যে ‘হিম্মত’ নামের একটি মোবাইল অ্যাপ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লীর গৃহমন্ত্রালয় গতমাসে দেশের সব বড় বড় শহরে এই মোবাইল অ্যাপটি কার্যকর করার জন্য সব রাজ্যকেই চিঠি লিখেছেন। ‘হিম্মত’ অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ছাড়া অন্য মোবাইলেও যাতে কাজ করে সেজন্যও গৃহমন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। মন্ত্রালয়ের একজন অধিকারী জানিয়েছেন, দিল্লীতে ‘হিম্মত’-এর সফলতার সঙ্গে সঙ্গে এটি এনসিআর সমেত পুরো ভারতবর্ষে চালু করার সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছেন। ওই অধিকারী জানিয়েছেন যে, দিল্লীতে বহুসংখ্যক মহিলা এই অ্যাপটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে চলেছেন।

‘হিম্মৎ’-এর কার্যপদ্ধতি’—

(১) ‘হিম্মত’ নামের এই অ্যাপটি সহজেই অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ডাউনলোড করা যায়। (২) নিজের নাম, ফোন নম্বর এবং আপাতকালীন (ইমারজেন্সি) নম্বর দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটি কার্যকরী (অ্যাক্টিভেট) হয়ে যায়। (৩) বিপদের সময় মোবাইলটি জোরে নাড়ালে অথবা ৫০৫ বোতামটি টিপলেই সূচনা সোজা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে যায়। (৪) এই অ্যাপ থেকে পুলিশ পীড়িতা মহিলার অবস্থান জানতে পেরে যায়। (৫) এইভাবে তৎক্ষণাৎ পীড়িতা মহিলার সাহায্যার্থে পুলিশ তার কাছে পৌঁছে যাবে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগকে দেশের মনীষীরা স্বাগত জানিয়েছেন বারংবার। ■

# কতিপয় বুদ্ধিজীবী ভারতের সম্মান নষ্ট করছেন

**অতিথি কলম**

অবধেশ কুমার

কদিন আগে কোয়েম্বাটুর থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে ফোন করেন। সেখানকার সংবাদপত্রে আমার নাম্বার তিনি পান। বললেন— 'স্যার, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। এই যে লেখকরা সমাজে মান্যগণ্য ও মানী লোক, তাঁরা সম্মান কেন ফিরিয়ে দিচ্ছেন? কোনো হত্যাকাণ্ড যদি দাদরি বা হুবলিতে হয় তাতে মোদীর কী দোষ? স্যার, আমাদের তো মনে হচ্ছে যাঁরা পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা এর যোগ্য ছিলেন না।' আরো বললেন, 'আমি বেশি লেখাপড়া জানা মানুষ নই, ছোটোখাটো কাজ করে পেট চালাই, আমার বলার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তো মাফ করবেন— এই সমস্ত লোকেদের পুরস্কার পাওয়াই উচিত ছিল না'। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে তাঁর নাম সুদর্শন মণ্ডল। বিহারের দ্বারভাঙা জেলার একটি গ্রামে থাকেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানের সব লোকের খুব রাগ হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সম্মান যত বাড়িয়েছেন, এসব লোক তা নষ্ট করে দিচ্ছে।' সাধারণ মানুষের থেকে আসা প্রতিক্রিয়ার এটি একটি নমুনামাত্র। এরকম প্রচুর প্রতিক্রিয়া প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ যারা কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, যাদের সরাসরি রাজনীতি বা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কোনো আদানপ্রদান নেই তাদের এটি মনের কথা। বলার তাৎপর্য হলো, সম্মান ফেরানো ও একে বড় বিষয় যারা তৈরি করছে তারা সমাজের সেই অংশের যারা মোদী, বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও আনুষঙ্গিক সংগঠনগুলির বিরোধী। যদিও ব্যক্তিগত কথাবার্তায় অনেক বেশি লোক সম্মান ফেরানোর হুল্লোড়কে উচিত মনে করছেন না।

সম্মান ফেরানোর পিছনে কোনো একটি নৈতিক বা ব্যবহারিক যুক্তি থাকা প্রয়োজন। সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া কতিপয় লেখকের বক্তব্য যে, এই পদক্ষেপ কেবলমাত্র হত্যার বিরুদ্ধে নয়, দেশে অহিষ্ণুতা বাড়ছে তার বিরুদ্ধে। এদের যুক্তি হলো, এম এম কলবুর্গির হত্যার পর যদি সাহিত্য আকাদেমি চুপ করে বসে না থাকতো বা এ নিয়ে হৈচৈ করতো তাহলে এই সুযোগ আসতো না। এটাই যদি তাঁদের কারণ হয় তাহলে তো পুরস্কার অনেক আগেই ফেরানো উচিত ছিল। যেহেতু সম্মান ফেরতকারীরা জনসমর্থন পাচ্ছেন না, তাই কিছু একটা তো তাদের করতে হবে। সবাই জানেন এঁরা মোদী, বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আজন্মবিরোধী। এঁরা না চাওয়া সত্ত্বেও মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এমন কোনো দোষ এঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না যাতে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। এজন্য এঁরা পরিকল্পনা মাফিক কেন্দ্র সরকারের বদনাম করার জন্য এসব করছেন। আর তার জন্য এঁরা নানারকম উলটাপালটা যুক্তি খাড়া করছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, সাহিত্য আকাদেমির ওয়েবসাইট দেখুন সেখানে কলবুর্গির হত্যার তীব্র প্রতিক্রিয়া তারা জানিয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি গত ৩০ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালুরুতে শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করে। সুতরাং সম্মান ফেরতকারীদের অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, ২৩ অক্টোবর এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবনাচিন্তার জন্য সাহিত্য আকাদেমি কার্যকরী সমিতির বৈঠক ডেকেছে।

কলবুর্গির হত্যা কর্ণাটক রাজ্যে হয়েছে, যেখানে কংগ্রেসের সরকার রয়েছে। হত্যার তদন্ত করা আইন বিভাগের বিষয়, যেটা রাজ্য সরকারের হাতে থাকে। কোনো ব্যক্তি কলবুর্গির হত্যা সমর্থন করেনি। যদিও তাঁর লেখায় আহত হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রচুর এবং তারা তাঁর বিরোধিতাও করতো। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হোত। সরকার তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পরে তিনি তা ফেরত দিয়ে দেন। পুলিশি তদন্তে তাঁর হত্যার কারণ স্পষ্ট পর্যন্ত হয়নি। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের বিষয়ও সামনে এসেছে। হতে পারে তাঁর লেখায় কেউ রুষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু আইনের পথে এর সমাধান কী? নিরপেক্ষ ও জোরদার তদন্ত হোক, দোষী শাস্তি পাক এবং এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। এর জন্য রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর প্রয়োজন। এতে কেন্দ্র সরকারের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। রাজ্য সরকার সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। দাদরির ঘটনা উত্তরপ্রদেশ সরকারের আইন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া

উত্তেজিত জনতা প্রকাশ্য দিবালোকে কোনো একজনকে কীভাবে হত্যা করতে পারে? এর মধ্যে সাহিত্য আকাদেমি বা কেন্দ্র সরকার কোথা থেকে এল? নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যা ২০১৩ সালে হয়, তখন কেউ পুরস্কার ফেরত দেননি। দোষীকে যখন রাজ্যসরকারের পুলিশ ধরতে পারেনি তখনও নয়। গোবিন্দ পনসারের হত্যা কংগ্রেস-এন সি পি শাসনকালে হয়েছে। তখনও রাজ্য সরকার দোষীকে ধরতে ব্যর্থ হয়। তখন কিন্তু কেউ পুরস্কার ফেরত দেননি বা সাহিত্যিকরা এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেননি। বরং বর্তমান মহারাষ্ট্র সরকারের আমলে দোষীকে ধরা হয়েছে। এর প্রশংসা না করে তাঁরা এমন পরিবেশ নির্মাণ করছেন যাতে মনে হচ্ছে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মজার কথা হলো যে, এই সাহিত্যিকরা পুরস্কার ফেরত দিতে বা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে বা বলতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

এই পরিস্থিতি প্রমাণ করছে দেশের মানুষের স্বাধীনতা বা দেশের পরিবেশ কোনো ভাবে বিপন্ন হয়নি। হ্যাঁ, এটুকু অন্তর এসেছে যে, আগে দেশের সাধারণ মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লাগার মতো লেখা বা বক্তব্যের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতো না, আর এখন তা হচ্ছে এবং বেশ ভালো সংখ্যায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে শুরু করে মিডিয়াতেও এরকম টিপ্পনী আসতে শুরু করেছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অর্থাৎ সমাজের ওই শ্রেণী যারা সহিষ্ণুতার চাপে নত হয়ে থাকাকেই ভবিতব্য মনে করেছিল, তারা আজ মুখর হয়ে উঠছে। এদের মুখরতা আরো বাড়বে। এখন লেখা ও বলার সময় ওই মানুষগুলির কথা ভাবতে হবে যা আপনারা এতদিন ভাবেননি। এই পরিবর্তন কোনো সরকারের কারণে আসেনি, বরং এই পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রে মোদী সরকার এসেছে। এটা এখন অস্বীকার করা যাবে না। যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই লেখকদের ধিক্কার ও নিন্দা করা হচ্ছে তাতে আমি সহমত নই। কয়েকবার এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছি। কিন্তু গভীরভাবে ভাবার পর বুঝতে পারি যে, হিন্দু সমাজ নিজের অস্মিতা ও পরিচিতির জন্য সক্রিয় ও সজাগ হচ্ছে। এই কারণেই এই লেখকদের পুরস্কার ফেরতে বিরোধিতা বেশি মাত্রায় হচ্ছে। এঁরা নিন্দা বেশি পাচ্ছেন, প্রশংসা খুবই কম। এঁদের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

এঁদের প্রকৃত স্বরূপ জানা প্রয়োজন। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে প্রখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হায়দরাবাদ প্রেসক্লাবে এ আই এ এম এম-এর সদস্যরা লাঞ্ছিত করে। তাঁর শাড়ি খুলে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। মেঝেতে ফেলে টেনেহিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর থেকে বেশি হিংস্র অপমান সম্ভবত কোনো লেখক বা লেখিকাকে করা হয়নি। তখন পুরস্কার ফেরত দেওয়ার কথা কারো মনে আসেনি। সলমন রুশিদিকে জয়পুরে সাহিত্য মেলায় আসতে দেওয়া হয়নি। তখন এঁদের মধ্যে কতজন লেখক বিরোধিতা করেছিলেন? এর আগে বিডি শর্মার পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কেউ পুরস্কার ফেরত দেননি।

২০১৩ সালে অসমে দাঙ্গা হয়েছিল, মজফ্‌ফরপুরেও হয়েছে। এঁদের মধ্যে কোনো লেখক সেখানে সমবেদনা জানাতে যাননি, পুরস্কার ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রেকর্ড দেখুন, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫-র মধ্যে ছোটবড় ৪৩৪৬টি দাঙ্গা হয়েছে। আজ কী এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, এই সাহিত্যিকরা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন? কাশ্মীরি পণ্ডিতরা আজ নিজ দেশে গৃহহীন হয়ে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ এর জন্য টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। তাঁদের কাছে এই বিষয় সাম্প্রদায়িক মনে হয়নি। নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যার পরও এঁদের পুরস্কার ফেরত দেওয়ার কথা মনে হয়নি। এ রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জহরলাল নেহরুর ভাগনি নয়নতারা সহগল ১৯৮৬ সালে পুরস্কার পেয়েছেন। মনে করুন, ১৯৮৪ সালে দেশে শিখ নরসংহার করা হয়েছিল, তার দেড় বছর পরে পুরস্কার নেওয়ার সময় তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়নি। গত ২৯ বছরে একবারও হয়নি, গোধরা কাণ্ড ও পরবর্তী দাঙ্গার সময় তাঁর বিবেক একেবারেই ঘুমিয়ে ছিল।

প্রশ্ন একটাই, এখন তাঁরা এরকম কেন করছেন? উত্তর খুবই সহজ। বর্তমান রাজনৈতিক পালাবদলের পর সাহিত্য জগতে এদের মহন্তগিরি শেষ হতে চলেছে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও দাপাদাপি কম হয়ে যাচ্ছে। শুধু সাহিত্য জগতে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরা প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার পাইয়ে দিয়ে যেভাবে লোকের উপকার করতেন সেই পরিস্থিতি আর নেই। এটা আর এঁনারা সহ্য করতে পারছেন না। সাহিত্যের রাজনীতিতে এঁরা ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছেন তা প্রথমে বুঝতে পারেননি। মজার কথা হলো, ৩৫ জন সাহিত্যিক পুরস্কার ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র ৯ জন সাহিত্য আকাদেমিকে পত্র দিয়ে জানিয়েছেন। বাকিরা কেবল সংবাদমাধ্যমকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এঁরা প্রত্যেকে পুরস্কারের সঙ্গে ১ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কেবল ৫ জন চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরত করেছেন। যাঁরা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান, তাঁদের রচনা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এঁদের মধ্যে একজনও বলেননি যে, সাহিত্য আকাদেমির তাঁদের রচনা আর অন্য ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই বা যা করা হয়েছে তা ফেরত নিক কিংবা আকাদেমি তাঁদের পুস্তকের প্রচার বন্ধ করে দিক। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তাঁরা সম্পূর্ণ ভণ্ডামি করছেন। সাহিত্য আকাদেমি ১ হাজারের বেশি লেখককে পুরস্কার দিয়েছে, যার মধ্যে কেবল ২৫ জন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। হতে পারে পারে আরও দু'চার জন ফেরত দেবেন। এর মধ্যেও এঁদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

সাহিত্য আকাদেমির খুব সহজভাবেই এঁদের পুরস্কার ফেরত নিয়ে নেওয়া উচিত। যাঁরা অর্থ ফেরত দেননি তাঁদের থেকে অর্থ নিয়ে অন্যদের পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। এঁরা এর যোগ্য নন। কেননা এঁদের মনোভাব দ্বিচারিতায় পরিপূর্ণ। এঁরা জগতের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করে দিচ্ছেন। ■

# জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ভারসাম্যহীনতার বিপদ নিয়ে আর এস এসের উদ্বেগ

***সম্প্রতি রাঁচীতে আর এস এসের কেন্দ্রীয় কার্যকারী সমিতির বৈঠক হয়ে গেল। সেই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবটি এখানে দেওয়া হলো।***

দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বক্তব্য হলো যে, ২০১১ সালের ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণনার বিশ্লেষণ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য রেখে জনসংখ্যানীতির পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে অনেক বেশি মাত্রায় ফারাক, অনবরত বিদেশি অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণের কারণে দেশের মোট জনসংখ্যা বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে ভারসাম্যহীনতার ফলে দেশের একতা, অখণ্ডতা ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির পক্ষে গভীর সঙ্কটের কারণ হতে পারে।

বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে ভারত ১৯৫২ সালেই পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু ২০০০ সালে সর্বাঙ্গীণ জনসংখ্যানীতি নির্মাণ ও জনসংখ্যা কমিশন গঠন করেছিল। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০৪৫ সালের মধ্যে মোট জন্মহার (TFR) ২.১-এর আদর্শ স্থিতিতে পৌঁছে স্থির ও সুস্থ জনসংখ্যার লক্ষ্য অর্জন করা। আশা ছিল যে, জাতীয় সম্পদ ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে জন্মহারের এই লক্ষ্য সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্য কার্যকরী হবে। কিন্তু ২০০৫-'০৬-এর রাষ্ট্রীয় প্রজনন ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা (ন্যাশনাল ফার্টিলিটি অ্যান্ড হেলথ্ সার্ভে) এবং ২০১১ সালের জনগণনার ০-৬ আয়ুর ধর্মীয় ভিত্তিতে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে মোট জন্মহারে 'অসমতা' এবং শিশু জনসংখ্যা অনুপাতের সঙ্কেত পাওয়া যায়। এটা এই তথ্য থেকেই প্রকাশ হয় যে, ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পর্যাপ্ত ফারাকের কারণে দেশের জনসংখ্যায় ভারতে উদ্ভূত মত-পথের মানুষের অনুপাত ৮৮ শতাংশ থেকে কমে যেখানে ৮৩.৪

*কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু বক্তব্য রাখছেন। পাশে ক্ষেত্রীয় কার্যবাহ অজয় নন্দী।*

শতাংশ হয়েছে, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ৯.৮ থেকে বেড়ে ১৪.২৩ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য যেমন অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশি, যা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশ থেকে অনবরত অনুপ্রবেশের সঙ্কেত দেয়। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নিযুক্ত উপমন্যু হাজারিকা কমিশনের প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সময়ে আসা আদালতের রায়ও এই তথ্য পরিপুষ্ট করছে। এটাও একটা সত্যকথা যে, অবৈধ অনুপ্রবেশ রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং এইসব রাজ্যের সীমিত সম্পদের ওপর বোঝাস্বরূপ হয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপের কারণ হয়ে উঠছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা আরও সংকটের আকার ধারণ করেছে। অরুণাচলপ্রদেশে ভারতে উদ্ভূত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ যেখানে ১৯৫১ সালে ৯৯.২১ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০০১-এ ৮১.৩ ও ২০১১ সালে ৬৭ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। কেবল এক দশকেই অরুণাচলপ্রদেশে খৃষ্টান জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এরকম মণিপুরের জনসংখ্যায় ভারতে উদ্ভূত এই অনুপাত ১৯৫১ সালে যেখানে ৮০ শতাংশের বেশি ছিল, তা ২০১১ সালের জনগণনায় ৫০ শতাংশ রয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত উদাহরণ এবং দেশের বহু জেলায় খৃষ্টানদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির হার দেশবিরোধী শক্তির সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত ধর্মান্তরণের মতো কাজেরই সঙ্কেত দিচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরীমণ্ডল জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত ভারসাম্য- হীনতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের নিকট আবেদন করছে : (১) দেশের সম্পদ, ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা এবং জনসংখ্যায় ভারসাম্যহীনতার সমস্যাকে মাথায় রেখে দেশের জনসংখ্যা নীতির পুনর্বিবেচনা করে সবার প্রতি সমানভাবে কার্যকরী করা হোক। (২) অবৈধ অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ চালু করে অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিক অধিকার ও জমিক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক।

অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান করছে যে, তারা নিজেদের কর্তব্য মনে করে জনসংখ্যায় ভারসাম্যহীনতার কারণগুলিকে চিহ্নিত করে জনজাগরণের মাধ্যমে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিধিবদ্ধ প্রয়াস করুন।

# সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের মতলব আজ পরীক্ষার মুখে

**সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

অতি সম্প্রতি সংবাদ সংক্রান্ত টিভি চ্যানেলগুলি খুললেই দেখা যাচ্ছে বিতর্কের অনুষ্ঠানগুলিতে সরকারবিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে কোনো বক্তাই একটি 'কমন' শব্দ ব্যবহার করছেন— আপনি 'অসহিষ্ণু' হচ্ছেন কেন? এ এক আজব মতলব। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে গভীর হতাশা, মনোবেদনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ।

*মুখের দুষ্টু হাসিতে রাজনৈতিক সার্থসিদ্ধির উদ্ভাস।*

মনে পড়বে বাজপেয়ীজী তাঁর সময়কালে বলেছিলেন, জোট সরকারের দিন শুরু হয়ে গেল। এইটাই ভবিষ্যতের ট্রেন্ড। আরও মনে পড়বে দ্বিতীয় ইউপিএ গঠনের সময় তুখোড় রাজনীতিক প্রণব মুখার্জীকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল— আপনাদের তো মাত্র ২০০ আসন, সরকার গড়বেন কীভাবে? তুঙ্গ আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রণববাবু বলেছিলেন, ''১৫৬ জন কংগ্রেস সাংসদ নিয়ে ৫ বছর চালিয়ে দিলুম, এখনতো হাতে ২০০ সাংসদ। চোখ বন্ধ করে সরকার গঠন হয়ে যাবে।'' এর তাৎপর্য গভীর। তিনি মূলত কংগ্রেসের দলছুট বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বা না থাকা ও বরাবরের ন্যাওটা সুযোগসন্ধানী বামপন্থীদের ওপর ভরসার কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এখন এই যে বিজেপি ছাড়া অন্যের ওপর অনায়াস নির্ভরতা— এটা যে কংগ্রেসেরই সৃষ্টি একথা প্রণববাবুর চেয়ে কেউই বেশি জানতেন না। প্রবীণ পাঠকদের মনে পড়বে ষাট-সত্তরের দশকে দেশে সোভিয়েত দেশ পত্রিকা ও বিপুল সোভিয়েত 'প্রপাগাণ্ডা' সাহিত্যের আগ্রাসন। সারা ভারতের নানান ভাষায় এই বই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া হোত। বৃথা যায়নি এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আপাত শান্ত বিদ্যাদানের মোড়কে ভারতীয় ধ্যান ধারণা বিলোপের চক্রান্ত। কংগ্রেস সরকার যখনই ক্ষমতায় থেকেছে এঁরা বা এঁদের খণ্ডাংশ তাকে তোল্লাই দিয়ে রেখেছে। বাধা দিয়েছে তৎকালীন জনসঙ্ঘের যে কোনো জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকর্মে। অথচ সমর্থক ছিল আদি বিপ্লবী দল সিপিআই-এর। একটা সহজকথা ভাবুন, আপনি যদি আপনার বংশ ইতিহাসের দিকে নজর করে দেখতে পান আপনার বাবা, অনেকক্ষেত্রে বকলমে মা, ঠাকুমা, দাদু থুড়ি পো-দাদু সকলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন আপনি কি ভাববেন না যে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া তো আমার জন্মগত। আর হঠাৎ সব জোট সরকারের তত্ত্ব নস্যাৎ করে একটি দল ও তার নেতা দিল্লীর তক্তে যদি বসে পড়েন তাহলে আপনার অবস্থা কী হবে? আকাশ থেকে পড়ার মতোই নয়কি? যে দিল্লীর সংসদ ছিল আপনার একচ্ছত্র আজ তা হাতছাড়া। সাকুল্যে দলের চুয়াল্লিশটি নির্বাচিত প্রতিনিধি। আপনার হৃত আবাসনে দীর্ঘ বসবাসের কারণে প্রচুর কীট, পতঙ্গ, পোকামাকড়েরও বাসা হয়েছে। আপনার অবর্তমানে সেই বশংবদ পতঙ্গবাহিনী নব আগন্তুককে কামড় দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই পুরস্কার বা সম্মান ফেরতকারীদের গরিষ্ঠাংশ শেষ বিচারে আপনার বদান্যতায় কৃতজ্ঞ। ঠিক যেমন ছিল ব্রিটিশের রায়বাহাদুর, রায়সাহেব বাহিনী। তাদের তালমিলের সরকার চলে গেছে। তারা নতমস্তকে আপনার বিধ্বস্ত দলের প্রাসঙ্গিকতা বাঁচাতে আপ্রাণ ক্যাম্পেন করে চলেছে। আপনাকে রাজনৈতিক পরাজয়ের অপমান ভুলিয়ে দেওয়াও তো তাদেরই দায়িত্ব। বাস্তবে তাকালে দেখা যাচ্ছে টিভিতে কোনো ভুঁইফোড় মুসলমান লেখক এতকাল পরে বই লিখে বলছেন রাম নাকি সপ্তসিন্ধু অঞ্চল অর্থাৎ পাকিস্তানে জন্মেছিলেন। তাঁর কথা আলোচকরা শুনছেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর অসারত্বে হতবাক হয়ে যাচ্ছেন। এক বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ মানুষের অন্যতম আরাধ্য দেবতার নির্ধারিত জন্মস্থানকে অনায়াসে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করছেন এক অন্যধর্মাবলম্বী অখ্যাত মোল্লা। লক্ষ লক্ষ দূরদর্শন-দর্শক তা দেখছে। এর নাম অসহিষ্ণুতা! সারা দেশের মানুষের ভোটে একটি নির্বাচিত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের সম্পর্কে কংগ্রেসের জনসমর্থনহীন নেতা ঈর্ষাকাতর মণিশঙ্কর আয়ার অসহিষ্ণুতার সমস্ত মাপকাঠি ভেঙ্গে বলছেন ''The most illiterate crowd are now loitering at the corridors of parliament'' (সবচেয়ে নিরক্ষর লোকগুলো এখন সংসদে ঘুরছে)। কতদূর স্পর্ধা ও বিজাতীয় ঘৃণা অন্তরে লালন করলে এমন কথা বলা যায়! সরকার অসহিষ্ণু? না কংগ্রেস দল? ভারতবর্ষের মুঘল আমলকে গরিমাময় করে তুলতে পারদর্শী, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ইতিহাসের ভুল পাঠ দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত

থাকা ঐতিহাসিক Irfan Habib বলেছেন—"RSS turning India a mirror image of Pakistan" অর্থাৎ পাকিস্তানে যেমন স্বাধীনতার পর থেকে ১৬ শতাংশ হিন্দুর সংখ্যা খুন, পলায়ন, ধর্ষণে মৃত্যুর কারণে আজ দেড় দু' শতাংশে নেমেছে ভারতেও তাই হয়েছে। স্বাধীনতার সময়ের ৯ শতাংশ মুসলমান এখন ১৪ শতাংশ। বহু রাজ্যে তারা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অজস্র কেন্দ্রে ভোটপ্রার্থীর ভাগ্য তাদের হাতে। আসাদুদ্দিন ওয়েসি চরম প্রতিহিংসামূলক দল খুলে ভোটে জিতছেন। হায়! এই মহান দেশদ্রোহী ঐতিহাসিক এসব হিসেব রাখেন না এমন ভাবার কারণ নেই। শুধু মনে হয় তিনি কি পাকিস্তানে গিয়ে বলার হিম্মত রাখেন যে সেখানে হিন্দুদের ওপর অবর্ণণীয় অত্যাচার হচ্ছে? এইসব সুবিধেভোগী কু-ইতিহাসবিদদের মতলব আজ পরীক্ষার মুখে। (দ্রষ্টব্য) Eminent Historians– Arun thourie)

তাই সরকার অসহিষ্ণু! কিছু রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা হারানোর শোকে পেটোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নিজেদেরকে একাত্ম করে দেওয়ার এই সংস্কৃতি জওহরলালের পর শ্রীমতী গান্ধী নরুল হাসান, ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদের মতো সাম্প্রদায়িকদের মাধ্যমেই কায়েম করেছিলেন। হাসান দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেস বা বাম মনোভাবাপন্ন লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এসব ৭০ দশকের কথা। তবে একবার ঢুকলে তো ত্রিশ চল্লিশ বছর দলীয় এজেন্ডা চালু থাকবে। এ প্রসঙ্গে চমৎকার বলেছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী চেতন ভগত, "এই তথাকথিত উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা যখন কোনো চায়না কাপে চা খেতে খেতে বৌদ্ধিক আলোচনা করছেন তখন জাতীয়তাবাদী দলের কর্মীরা রাস্তায় বুক চাপড়ে আন্দোলন করছে।" জাতীয়তাবাদীরা তাদের মতকে বাজারে ছড়াবার কৌশলী পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর সরকারে থাকার সুযোগও তাদের বিশেষ হয়নি। নইলে গোধরায় বদ্ধ কামরার মধ্যে যখন ৭২ জন অসহায় মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো বা হালে কেরলের মৌলবাদী মুসলমান গুণ্ডাদের দল পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ২০১০ সালের ৪ জুলাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মহম্মদকে অপমান করা হয়েছে অভিযোগ তুলে প্রফেসর টি জে জোসেফ-এর হাতের পুরো পাঞ্জাটাকেই কেটে নিল তখন এই বুদ্ধিজীবীরা কেউ পুরস্কার ফেরত দেওয়ার কথা ভাবেনওনি। পরবর্তীকালে কলেজ ওই অধ্যক্ষ ফের চাকরি মেনে নেন। আবার ওই ২০১০ সালেই হুডার কংগ্রেস শাসনের হরিয়ানা প্রকাশ্য দিবালোকে উচ্চ সম্প্রদায়ের উন্মত্ত জনতা দলিত বৃদ্ধ তারাচাঁদ (৭২) ও তাঁর ১৮ বছরের প্রতিবন্ধী মেয়ে সুমনকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল। তখন এঁরা সেই কোন চায়না কাপে চা খাচ্ছিলেন। একটি চুলও ফেরত দেননি। হায় বিজেপি দল! তোমার তো পাশে দাঁড়াবার মতো, সাদাকে সাদা বলবার মতো বুদ্ধিজীবী তৈরিই হয়নি যারা এই হার্ডকোর, লালিত বুদ্ধিজীবীদের পাল্লা নেবে।

অন্যদিকে এখন এক শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর বাণী আম জনতা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে এসেছে। তারাই সত্যের ধারক ও বাহক। এই মর্মে দু'টি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথচ পৃথক উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞানপীঠ মানপত্রটিতে লেখা ছিল, 'The author is a litercry visionary... devoted to quest of lifes fundamental truth" অর্থাৎ লেখক সাহিত্যিক মার্গদর্শক, যিনি নিজেকে সত্যান্বেষণে উৎসর্গ করেছেন। আমাদের সাহিত্যিকদের সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর কিছু বাছাই নমুনা আগেই পেশ করা হয়েছে। এবার দেখা যাক প্রবাদ প্রতিম আমেরিকান সাহিত্যিক Mark Twain-এর মজাদার কিন্তু গূঢ় পর্যবেক্ষণটি, "Most writers regard the truth economical in its use." বেশিরভাগ লেখকই সত্যজ্ঞানকে তাঁদের জীবনের সেরা অর্জন বলে গণ্য করেন; তাই এই সত্য বিতরণে বা প্রকাশ্যে তারা সদাই কৃপণ।

আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশ্বখ্যাত লেখকের উক্তিটিই বেশি খাপ খায়। যে ব্যক্তি কোনো অপকর্মের সাক্ষী থেকেছে অর্থাৎ সত্যটা জানে কিন্তু সাক্ষী যেমন টাকা খেয়ে চুপ করে যায় বা প্রয়োজনে বাবুর হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেয় আজকের পরিস্থিতি অনেকটা এরকমই নয় কি?

যাইহোক, আরও একটি অপ্রিয় অতীত ইতিহাস থেকে এই অসহিষ্ণুতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে শেষ করব। সেই ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর অসহিষ্ণুতায়। তিনিই মোতিলাল নেহরুর ছেলে জওহরলালকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছিলেন পথের কাঁটা সরিয়ে। জওহরলাল তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সত্যনিষ্ঠ জামাতা ফিরোজকে কখনও সহ্য করেননি, নীরব অত্যাচার চালিয়েছেন। ইন্দিরার জরুরি অবস্থা জারির অসহিষ্ণুতা ও ক্ষমতা ধরে রাখার কাহিনি বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই পরম্পরায় অসহিষ্ণু সোনিয়ার নরসিংহ রাওয়ের মরদেহ দিল্লীতে সৎকার না হতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কুৎসিৎতম নিদর্শন। অসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠায় তাঁকেও ছাপিয়ে গেছেন তাঁর বালখিল্য পুত্র যিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের কপি অকাতরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন (লালুর সাজা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত)। এমন জমিদারি মানসিকতার দলের আজ দুর্দিন। তবে জমিদারবাড়িতে তো শুধু জমিদারই থাকে না, অজস্র মোসায়েব, মনসবদার, অনুগৃহীত প্রজারও সেটি আবাসস্থল। দেশের অগণন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকটা অক্টোপাশের মতো ছড়িয়ে আছে জমিদার দলের প্রজাকুল। তাদেরই কৃত্রিম আর্তনাদে ভরসা করে মা ও ছেলে দেশ রসাতলে গেল বলে মার্চ পাস্ট করে ফেলেছেন। তবে দেশের বিপন্নতায় চিন্তিত মা-ছেলের যে ছবি হাসপাতাল, শ্মশান, কবরস্থানে গেলে তার মনের অন্তর্লীন বিষাদের কিছু ছায়াপাত হয় তার মুখমণ্ডলে, এখানে দেশ উদ্ধারকারী ছেলেটি মায়ের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বড়ই নিশ্চিন্ত। মুখের দুষ্টু হাসিতে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্ভাস। ◻

# সংখ্যালঘুরা কি নিজেদের ভারতীয় মনে করে ?

দেবব্রত চৌধুরী

আজ প্রশ্ন উঠেছে স্বাধীনতা লাভের ৬৮ বৎসর পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচিত ভারতে কী কারণে উত্তরপ্রদেশের মজফ্ফরনগর ও দাদরিতে বিস্ফোরণ ঘটল এবং কেনই বা সহনশীল উদার বলে খ্যাত হিন্দু সমাজ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য গত একশো বছরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন হিন্দু সমজকে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে (শ্রাবণ ১৩৩৮) লিখেছিলেন, পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু 'তালি' দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের যা প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে না। এমনকী পলিটিকসের এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই। এ ফোঁকরা জোড়টার কাছে বারে বারেই চাপ পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব— আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায় নইলে কিছুতেই কখনো হবে না।" আসলে কবিগুরু বলতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের ধর্মকে মুখ্য না ভেবে মনে প্রাণে 'ভারতীয়' হয়ে যেতে। তাই হয়তো লিখেছিলেন--- 'শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন'। কিন্তু মুসলমান সমাজ কি কবিগুরুর এই আহ্বানকে কোনো মর্যাদা দিয়েছে ?

দেয়নি বলেই মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে বলেন— 'Hindus and Muslim are two seperate nations with their different religious, philosophy, social customs and literature. So this nation could not stay under same roof'--- এর ফলশ্রুতি ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তানের সৃষ্টি। কারণ আদি ভারতবর্ষ হলো অমুসলমান দেশ, অপবিত্র দেশ, অতএব মুসলমানদের মাতৃভূমি নয়। এই মনোভাবের প্রকাশ মেলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে সৈয়দ শামসুল হুদার একটি প্রতিবেদনে। হুদাসাহেব ছিলেন বৃটিশ গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। হিন্দুর দেশপ্রেম এবং মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে লেখেন (১৯১২ অক্টোবর), ''There is a distinction between patriotic feelings of the Hindu and Mohamadan. The Patriotism of a Hindu consists in his for his country unfortunately for the Mohamadan. They took upon India is their land of adoption. Their patriotism is extraterritorial it has its origin in a Religious sentiment (সূত্র : Hindu Response to Nationalist গ্রন্থ এর উদ্ধৃতি— ড. পাপিয়া চক্রবর্তী)। মুসলমানরা চিরকাল ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি না ভেবে দত্তকরূপে গৃহীত দেশ বলে ভাবতে অভ্যস্থ। মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক আজাদের সম্পাদক মৌলানা আক্রম খাঁ আরব ভূখণ্ডকে মানবের আদি মাতৃভূমি বলতে উচ্ছ্বসিত হতেন, অথচ ভারতবর্ষকে 'মা' বলে সম্বোধন করা বা 'বন্দেমাতরম্'-এর উচ্চারণ তাঁর নিকট ছিল ইসলাম বিরোধী। স্বাধীনতার পরও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নুরুল হাসানও পাঠ্য বইয়ে বন্দেমাতরম্ শব্দে বা স্কুলে বন্দেমাতরম্ আওয়াজ তোলার বিরোধী ছিলেন। সম্প্রতিকালে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি গোঁসা করে বলেছেন, ভারতবর্ষকে তারা অনেক দিয়েছেন— মুসলমানরা ভারতকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যে উন্নত করাতে অনেক সাহায্য করেছেন কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছেন ? এই সদম্ভ উক্তির মধ্যে ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করার কোনো প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নেই, বরং লক্ষ্য করা যায় বিদ্বেষের নিঃশ্বাস আর আগ্রাসী মেজাজ। বিপিনচন্দ্র পাল 'প্যানইসলামিক' শিরোনামে একটি অসামান্য প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৩ সালের এই প্রবন্ধে তিনি এক মুসলমান পত্রিকার সম্পাদক জাফর আলির উদ্ধৃতি দেন— ''The Indian Muslims think that they are 'Muslim' first and Indian afterward''। বিশেষভাবে স্মরণীয় ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর সিমলায় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিগের নেতা সৈয়দ আমির আলি যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে হিন্দুদের অন্ত্যজ ব্রাত্য এবং জড়োপাসক বলে ঘৃণ্য মন্তব্য করেছিলেন। মহম্মদ আলি ভারত ভাগ করে পাকিস্তানের দাবি করেন কিন্তু 'Exchange of Population'-এর কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন, ধর্মানুযায়ী হিন্দু-মুসলমান তাদের নিজেদের ধর্মানুরাগীদের দেশে চলে যাবে দেশভাগের পর। ভারতীয় মুসলমানরা জিন্নার দাবি অনুযায়ী পাকিস্তানের পক্ষে ১৯৪৬ সালে ৮৬ শতাংশ ভোট দিলেও কিন্তু দেশভাগের পর কতজন তাদের আদায়ীকৃত পাকিস্তানে গিয়েছেন ? ১৯৪৭-১৯৫১ সালে জনগণনায় জানা যায় এই সময়ে East Pakisthan থেকে ১.৭৫ কোটি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন আর এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫৮ হাজার মুসলমান পাকিস্তানে যায় (সূত্র : Indian State craft-vis-A-vis

Secularism)। ইসলাম বিশেষজ্ঞ ভারতরত্ন ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, পাকিস্তান দিয়ে তারপর সংখ্যালঘু বিনিময় করতে যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরস্থায়ী রূপে দূর হয় (That the transfer of Minorities is the losting remedy for communal peace is beyond doubt" V.B.P. 116)। তিনি বলেছিলেন যে গ্রীস, তুরস্ক, বুলগেরিয়া যদি সংখ্যালঘু বিনিময় করতে পারে তবে ভারত কেন তা পারবে না। তাঁর কথায় সাম্প্রদায়িক শান্তির এই স্থায়ী নিশ্চিত পথ ত্যাগ করা হবে প্রচণ্ডতম মুর্খামি, ('It would be the highest folly to give up so sure a way to communel peace')। মুসলমানরা ভারতকে নিজ মাতৃভূমি না ভাবার জন্য দেশের হিন্দুদের কখনও আপন করেনি, বরং সর্বসময়ে বৈরী মনোভাব নিয়ে চলেছে। হিন্দু মেয়েদের উপর মুসলমানদের চিরকালের লোভ। এ ব্যাপারে ১৯৪৬ সালে কলিকাতা নোয়াখালির দাঙ্গার পর তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালানী বাংলার ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার ও ধর্ষণের কথা বলেন। তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব বলেন, ''এটা স্বাভাবিক কারণ হিন্দু মেয়েরা মুসলমান মেয়েদের চেয়ে সুন্দরী'' (সূত্র : Indian State-craff-vis-A-vis-Secularism M.C. Maitra)। সেই tradition আজও চলছে। কামদুনিতে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে দেহটিকে ছুড়ে ফেলে দিল আর ভোটের লোভে শাসকদল ধর্ষণকারীদের নির্দোষ প্রমাণের জন্য পুলিশকে চাপ দিল। কারণ ধর্ষণকারীরা মুসলমান। ধর্মতলায় অনিতা দেওয়ানকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল তারাও মুসলমান। বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী জোতিবাবু বলেছিলেন, 'এরকম তো কতই হয়'। সব হচ্ছে মুসলমান তোষণনীতি। এ নিয়ে বামফ্রন্ট তৃণমূলের প্রতিযোগিতা চলছে। কংগ্রেস আমলে তৎকালীন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল রহমান আন্তুলে-কে মুম্বই শহরের বিখ্যাত হিন্দুমন্দির সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দুকে মসজিদ মাদ্রাসার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে?

জম্মু-কাশ্মীর- মিজোরাম-নাগাল্যান্ড- অরুণাচল মেঘালয়ে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা পায়? পৃথিবীর ৫৭টি মুসলমান রাষ্ট্র আছে সেখানে কোথাও কি রাজকোষ থেকে টাকা নিয়ে হজযাত্রীদের ভরতুকি দেওয়া হয়? ভারতে কেন আছে? সবই হচ্ছে ভোটের লোভ। এনডিএ সরকারের আমলেই মুসলমান প্রেসিডেন্ট, হিন্দু প্রধানমন্ত্রী ও খৃষ্টান বিদেশমন্ত্রী হতে পারে। তবু বলা হয় বিজেপি সাম্প্রদায়িক।


১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

# ‘রিটায়ার্ড বাট নট টায়ার্ড’

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** অধিকাংশ লোক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজেদের বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করেন। কেউ বা অলস দিনযাপন করতে শুরু করেন। কেউ আবার সারাদিন তাস খেলাকেই জীবনের ব্রত করে ফেলেন। তাঁরা মনে করেন তাঁদের সমস্ত দায়দায়িত্ব শেষ। কিন্তু কেউ কেউ অবসর গ্রহণের পর নতুন শক্তিতে নতুনভাবে জীবন শুরু করেন।

*শ্যামবিহারী প্রসাদ*

এ রকমই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ নতুন দিল্লীর বসন্তকুঞ্জের বি-সেক্টরের শ্যামবিহারী প্রসাদ। এখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তিনি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বি এস এন এল)-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের পদ থেকে ৫ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজেকে বৃদ্ধ ভাবেননি বা অলস জবীনযাপনও করেননি। গরিব ছেলেমেয়েদের ফুটপাতে বসিয়ে পড়ানোর মতো গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনি অবসর নেওয়ার আগেই দেখতেন স্থানীয় হনুমান মন্দিরে পূজা দিতে আসা লোকজনদের কাছে ভিক্ষা চাইছে গরিব কিছু ছেলেমেয়ে। তিনি তাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে নাম জিজ্ঞাসা করতেন। তারা নাম বলতো। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতো— ভালো লাগে না। তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অবসর গ্রহণের পর পড়াশুনার প্রতি এদের রুচি সৃষ্টি করবেন। গত পাঁচ বছরে এ কাজে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছেন। আর একেই তিনি ঈশ্বরের পূজা মনে করছেন।

শ্যামবিহারীর কথায়— ‘যেদিন থেকে আমি এদের পড়াতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই তারা মানুষের কাছে হাত পাতা বন্ধ করে দিয়েছে। এরা সবাই সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়ে আছে। কিন্তু স্কুলে যায় না। অক্ষর জ্ঞানও নেই। বসন্তকুঞ্জের হরিজন পল্লীতে থাকে এরা। এদের বাবা-মা পেশাগত কাজ করে। কেউ কেউ রাজমিস্ত্রি বা অটোচালক।”

তাঁর ফুটপাতের পাঠশালায় ২০/২২ জন প্রতিদিন পড়তে আসে। সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রতিদিন স্কুল চলে। সপ্তাহে সাত দিনই। সরকারি ছুটির দিনও ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। শ্যামবিহারীর কথায়— গত পাঁচ বছরে সব ছেলেমেয়ের তাদের নিজের স্কুলে যাওয়ার রুচি সৃষ্টি হয়েছে। তারা জানিয়েছে এখন শিক্ষকমশাই তাদের খুব ভালোবাসে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। সরকারি স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়া রাজুর কথায়— ‘আমি বন্ধুদের সঙ্গে হনুমান মন্দিরে আসা লোকের কাছে পয়সা চাইতাম। একদিন শ্যামবিহারীজী আমাদের নাম-ধাম, পড়াশুনা করি কি না জিজ্ঞাসা করেন। আমরা টেরা টেরা উত্তর দিয়েছিলাম। তবু তিনি আদর করে আমাদের পড়াতে শুরু করেন। এখন আমাদের পড়তে খুব ভালো লাগে। স্কুলের শিক্ষকমশাই যে কোনো প্রশ্ন করলে আমরা উত্তর দিতে পারি। শ্যামবিহারীজী সেদিন আমাদের না ধরলে আমরা পড়ার মর্মই বুঝতাম না।’

শ্যামবিহারী বলেন, তাঁর এই কাজ দেখে আশেপাশের লোকেরা খুব খুশি। তাঁরাও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করছেন। অনেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য ব্ল্যাকবোর্ড, খাতা-কলম কিনে দেন। কেউ কেউ প্রতিদিন ২০/২৫ জন ছেলেমেয়ের জন্য খাবার দিয়ে যান।

স্থানীয় দোকানদার অনিলকুমার বলেন, ‘শ্যামবিহারীজীর গরিব ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় পড়ানো দেখে আমাদের সেক্টরের সবাই তাঁকে সহযোগিতা করেন। পড়ানোর জায়গা আমরা বেঁধে দিয়েছি। বর্ষার সময় মন্দিরের বারান্দায় বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।’

শ্যামবিহারীর কথায়--- ‘এই ছেলেমেয়েদের মতোই আমার জীবন ছিল। গরিব হওয়ার জন্য পড়াশুনার পরিবেশ ছিল না। গ্রামেরই একজন সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে জোর করে পড়ার রুচি সৃষ্টি করিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে বিহারের ‘স্যার গণেশ দত্ত পাটলিপুত্র হাইস্কুল’ থেকে ক্লাস টেন পাশ করে পাটনা কলেজে ভর্তি হই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি পাশ করি।

১৯৭৪ সালে বি এস এন এল-এ চাকরি পাই। আমার এক মেয়ে দিল্লীর ডি আর ডিও-তে বৈজ্ঞানিক আর দুই ছেলে পুনায় ইঞ্জিনিয়ার।’

তিনি মনে করেন ছোটবেলায় কেউ যদি ভালোবেসে কাউকে সত্যিকারের পথ দেখায় তাহলে ভবিষ্যতে সে সঠিক পথে চলতে পারবেই। একটু নজর ও ভালোবাসার অভাবে কত ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায় তার হিসাব কেউ রাখে না।

তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বললে তিনি তাদের শুনিয়ে দেন— ‘যব তক কাম না পূরণ হোগা নাম নহী বিশ্রাম কা।’ তিনি জোরের সঙ্গে বলেন— ‘আমি রিটায়ার্ড, বাট নট টায়ার্ড।’

# গীতা জীবন গঠনের ও আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের বিজ্ঞান

## পুস্তক প্রসঙ্গ

**দেবানন্দ ব্রহ্মচারী**

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রশস্তিতে বলা হয়েছে, 'মা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা'— যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ নারায়ণের মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃতা, সেই গীতা উত্তমরূপে পাঠ করা কর্তব্য— 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'। আর বলা হয়েছে, অন্য অধিক শাস্ত্রপাঠের আর কী প্রয়োজন 'কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ'? গীতার ধ্যানের মধ্যে উল্লেখ আছে— চার বেদের অন্তর্গত যে ১০৮ খানি উপনিষদ আছে সেই উপনিষদকে যদি গাভীরূপে কল্পনা করা হয় তাহলে সেই গাভীর যে সারবস্তু দুগ্ধ তা হলো গীতা। কিন্তু উপনিষদরূপ গাভী থেকে গীতারূপ দুগ্ধ দোহন করেছেন কে? তখন বলেছেন 'দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ'— গোপালক, নন্দরাজার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাই বলা যায়, গীতা হলো অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার- স্বরূপ বেদের সার বস্তু এবং বেদের মতো গীতাও অপৌরুষেয়।

অর্জুন হলেন আমাদেরই প্রতিনিধি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতবাসীর কল্যাণের জন্য এই গীতা উপদেশ করেছেন। গীতা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নয়, গীতা সমগ্র মানব সমাজের গ্রন্থ। গীতা আদর্শ জীবনগঠনের গ্রন্থ, আদর্শ ধর্মরাজ্য স্থাপনের গ্রন্থ, অধ্যাত্ম সাধনার পথনির্দেশক গ্রন্থ। তাই গীতা সকলেরই গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সেজন্য এই গীতার ভারতবর্ষে যেমন ভাষ্য রচনা করেছেন আচার্য শঙ্কর, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী, স্বামী আনন্দগিরি, শ্রীধর স্বামী প্রমুখ, তেমনি আবার ইংরাজি, ফরাসি, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি পৃথিবীর ছত্রিশটি ভাষায় গীতার পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হয়েছে (স্বামী জগদীশ্বরানন্দকৃত গীতা, উদ্বোধন কার্যালয় দ্রষ্টব্য)।

গীতার কালখণ্ড— পাঁচ হাজার একশ পনেরো বছর পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি। আশ্চর্য ঘটনা হলো, ৫০০০ বছর ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে গীতার ওপর গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি। বর্তমানে সুন্দরবন

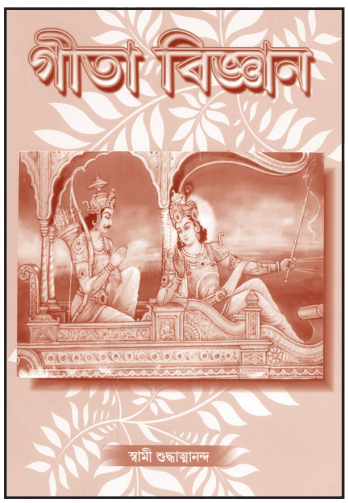


অঞ্চলের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ 'গীতা বিজ্ঞান' নামে গীতার ওপর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। গীতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে আগ্রহী পাঠকের পক্ষে গ্রন্থটি অমূল্য সম্পদ বলা যায়। লেখক স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী সুপণ্ডিত এবং তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে গীতার অনুধ্যান, পাঠ, প্রবচন করে আসছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সাড়ম্বরে পালন করছেন গীতাজয়ন্তী উৎসব।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে লেখক গীতা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ মহাত্মার বাণী উল্লেখ করায় গীতার বিষয়বস্তু আরও প্রাঞ্জল হয়েছে।

শুদ্ধাত্মানন্দজীর এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে, স্বতন্ত্রভাবে নামাঙ্কিত করে আলোচনা করেছেন। যেমন প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগে— 'রণক্ষেত্রে গীতোপদেশ', 'বিষাদযোগের প্রয়োজনীয়তা' প্রভৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে— 'কাপুরুষতা ও দুর্বলতায় মোহাচ্ছন্ন পরন্তপ', 'সর্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদন' প্রভৃতি। আরও বৈশিষ্ট্য হলো— লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'উপসংহার' করেছেন এবং সেই অধ্যায়ের শিক্ষা কী? সে বিষয়ে সংক্ষেপে জানিয়েছেন। এই 'উপসংহার' ও 'শিক্ষা' পাঠকদের কাছে বিশেষ উপযোগী হবে বলে মনে হয়। শুদ্ধাত্মানন্দজী বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন এবং সেই গ্রন্থগুলির 'গ্রন্থপঞ্জী' নামে তালিকাও প্রকাশ করেছেন। এর ফলে আগ্রহী পাঠকদের গ্রন্থ বিশ্লেষণে, জ্ঞান আহরণে অনেক সুবিধা হবে।

'গীতা বিজ্ঞান' গ্রন্থটি গীতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক অভিনব সংযোজন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

**গীতা বিজ্ঞান : পৃষ্ঠা—৮৯০।**
**মূল্য—৫০০.০০।**
**লেখক : স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ।**
**প্রকাশক : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।**

# মালদায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মসার্ধশতবর্ষ

গত ৪ অক্টোবর মালদা জেলার গাজোল ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে অন্নদাশঙ্কর সদনে পালিত হয় উত্তরবঙ্গের প্রাণপুরুষ মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সার্ধশতবর্ষ উৎসব। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল রাজবংশী ভাষা আকাদেমি কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পরিচালনায় মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মসার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, মালদা জেলা।

সকাল ১০.৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। তারপর স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা ভাওইয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা সভা। এদিনের বিশিষ্ট অতিথিরা হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ এবং রাজবংশী ভাষা আকাদেমির সভাপতি বিজয় চন্দ্র বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুরের এ ডি এম ড. অমল কান্তি রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি গিরিন্দ্রনাথ বর্মন, শিলিগুড়ির চিত্তরঞ্জন বর্মন, কলকাতার ড. উদয়শঙ্কর বর্মন, উত্তর দিনাজপুরের শ্যামাপদ রায়, দক্ষিণ দিনাজপুরের বিরামচন্দ্র বর্মন এবং বেশ কয়েকজন কলেজের অধ্যাপক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গাজোলের বিধায়ক সুশীল রায়, বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রভাত পোদ্দার প্রমুখ।

এদিন মঞ্চ সঞ্চালন করেন রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক দীপক বর্মন। প্রাস্তবিক ভাষণ দেন মালদা জেলা কমিটির

সম্পাদক বনমালী বর্মন। বক্তব্য রাখেন জিতেন্দ্রনাথ সরকার, জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয় চন্দ্র বর্মন, ড. অমল কান্তি রায় প্রমুখ। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনী এবং রাজবংশী সমাজ তথা গোটা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন আন্দোলনে তাঁর অবদান বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন গিরিন্দ্রনাথ বর্মন এবং শিলিগুড়ি থেকে আগত চিত্তরঞ্জন বর্মন।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী সঙ্গীতা রায় ও তাঁর সম্প্রদায়।

# তারকেশ্বরে সমাজসেবা ভারতীর বস্ত্রবিতরণ

তারকেশ্বর জেলার কামারপুকুর খণ্ডে সমাজসেবা ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ) অনুমোদিত শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের পরিচালনায় ৫টি গ্রাম বিকাশ সমিতির মাধ্যমে দুর্গা পূজার প্রাক্কালে ৫ স্থানে ১৬টি সংস্কার কেন্দ্রের ৬০ জন শিশু ভাই-বোন ও ৭ জন দরিদ্র বৃদ্ধাকে বিশেষ অনুষ্ঠানে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত খাদ্য আধিকারিক আদিত্য পণ্ডিত ও পুঞ্জের সম্পাদক বিশ্বকান্তি সেন উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে এই গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের পরিচালনায় ৫টি সমিতির মাধ্যমে ৮টি গ্রামে ২৮টি স্থানে ৭৫টি নিত্য ও নৈমিত্তিক সেবাকাজ চলছে। ২৫০ জন তরুণ-যুবক-প্রবীণ এই কাজে শ্রম-অর্থ-সেবা উপকরণ ও স্থান দানের মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

সমাবেশ সমাচার

# নাগপুরে শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ষষ্ঠ ত্রৈবার্ষিক রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ৯, ১০, ১১ অক্টোবর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ষষ্ঠ ত্রৈবার্ষিক রাষ্ট্রীয় অধিবেশন নাগপুরে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে ভারতের ২৭টি রাজ্য থেকে প্রায় দু' হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। অধিবেশনে সারা দেশের সমস্ত শিক্ষা সংগঠনের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি উপস্থিত ছিলেন। তিনি শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘকে অতি দ্রুততার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতা ও শিক্ষার স্বার্থে কাজ করতে আহ্বান জানান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অজিত বিশ্বাস, অবনীভূষণ মণ্ডল ও দীনেশচন্দ্র সাহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ, বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের ৯২ জন শিক্ষক ও অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী দু'দিন উপস্থিত থেকে শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এই মঞ্চে ভারতের তিন জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদকে সম্মান প্রদান করা হয়। তাঁদের 'শিক্ষাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেষে পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রচারক আলোক চট্টোপাধ্যায়কে সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হলো বলে ঘোষণা করা হয়।

# সিউড়ী কল্যাণ আশ্রমের বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান

গত ১২ অক্টোবর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সিউড়ী নগর সমিতির উদ্যোগে বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার ব্লকের অন্তর্গত বেলগড়িয়া গ্রামে ওরাঁও জনজাতির ২৬ জন বালক-বালিকাদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অনুপ দাশগুপ্ত, বেলগড়িয়া গ্রামের ওরাঁও জনজাতির সর্দার কিঙ্কর ওরাঁও, সিউড়ী নগর সমিতির সদস্যবৃন্দ। শ্রীদাশগুপ্ত পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কাজ, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কিঙ্কর ওরাঁও ওরাঁও জনজাতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং রমেশ কিস্কু সকলকে এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। কিঙ্কর ওরাঁও-য়ের মাদল বাজনার তালে গ্রামের মায়েরা কুরুদ ভাষায় সমবেত গান করেন এবং ছোট্ট বোনেরা নৃত্য পরিবেশন করে। মহালয়ার এই শুভদিনে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম সিউড়ী নগর সমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠান দেখে গ্রামবাসীরা খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত হন।

# মালদা সরস্বতী শিশু মন্দিরের মাতৃসম্মেলন

গত ৭ অক্টোবর মালদার টাউন হলে নেতাজী সুভাষ রোড-স্থিত সরস্বতী শিশু মন্দিরের মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন সরস্বতী শিশু মন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিভাস রঞ্জন ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জালালিয়া উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম মুখার্জী।

প্রাস্তবিক ভাষণ দেন শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্য ভীম চন্দ্র মাহাতো। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে মায়ের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিশু মন্দিরে পরিচালন সমিতির সম্পাদক তথা ললিত মোহন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল। মায়েদের ভূমিকা নিয়ে ভাষণ দেন প্রধান অতিথি শ্রীমতী কুমকুম মুখার্জী। ভাষণ দেন বিদ্যাভারতীর মালদা পুঞ্জের প্রমুখ পঙ্কজ সরকার।

অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক, সমবেত সঙ্গীত ও গম্ভীরা গান গেয়ে শোনায় শিশু মন্দিরের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা। হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন সজল দত্ত, তবলায় অনুপম চৌধুরী। দু'টি সুন্দর নৃত্যও পরিবেশিত হয়। শেষের আকর্ষণ ছিল আচার্য তাপস চক্রবর্তীর গীটার বাদন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিভাস রঞ্জন ঘোষ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সোনালী কুণ্ডু এবং পরেশচন্দ্র সরকার।

## বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৭ অক্টোবর বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির নিজস্ব ভবনে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য প্রমুখ। সভায় ২০১৪-২০১৫ সনের বাৎসরিক কার্য বিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ রায়।

**নবগঠিত সমিতি :** সভাপতি— অজয় কুমার নন্দী, সহ- সভাপতি— তপন কুমার নাগ ও জীবনময় বসু, সাধারণ সম্পাদক— তপন কুমার গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক— বিশ্বনাথ নন্দী, সদস্য— অদ্বৈত চরণ দত্ত, রমাপদ পাল, বিদ্যুৎ মুখার্জী, ড. বিজয় আঢ্য, তরুণ পণ্ডিত, প্রণয় রায়।

সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক আইনজীবী অজয় কুমার নন্দী।

# সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার আগমনী অনুষ্ঠান

গত ১৮ অক্টোবর রাজপুর বাদামতলা দুর্গোৎসব কমিটির আমন্ত্রণে মহাপঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখা পরিবেশন করে আগমনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় চণ্ডীপাঠ-সহ সঙ্গীতালেক্ষ্য দুর্গা-দুর্গতিনাশিনী। রচনা ও পরিচালনা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতপরিচালনা ও সুরারোপ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং চণ্ডীপাঠে নিত্যানন্দ মুখার্জী ছিলেন অনবদ্য।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীচক্রবর্তী আলেক্ষ্য ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি রচনা করেছেন। শ্রীচক্রবর্তী-সহ সঙ্গীত পরিবেশন করেন উত্তম ভট্টাচার্য, অভিজিত মণ্ডল, গৌরব মণ্ডল, লিলি চক্রবর্তী, অনিন্দিতা মুখার্জী, তানিয়া দাস, মালবিকা ঘোষ, সুস্মিতা মল্লিক ও কোয়েল সাঁপুই। তালবাদ্যে প্রশান্ত মণ্ডল। ভাষ্যপাঠে উদয়ন সরকার ও অন্তিমা মান্না (সাহু)। বিগত দশ বৎসর ধরে আলেক্ষ্যটি পরিবেশিত হচ্ছে এবং প্রতিবারের ন্যায় এবারও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়া অনুষ্ঠানের শুরুতে তানিয়া দাস ও সুমিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গীত ও বিনতা বারুইয়ের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান ছিল উল্লেখযোগ্য।

# উত্তরবঙ্গে সঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষণ বর্গ

গত কয়েকবছর যাবৎ উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বেড়ে চলেছে। এবার পূজার ছুটিতে সারা উত্তরবঙ্গে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বর্গে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল। উত্তরবঙ্গ নয়টি স্থানে জেলা অনুসারে বর্গ হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষাবর্গে জেলানুসারে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল এইরূপ— উত্তরদিনাজপুর ১২৭, মালদা ১২০, উত্তর মালদহ ২১, উত্তর মুর্শিদাবাদ ৩৮, আলিপুরদুয়ার ৯৭, কোচবিহার ৯৭, পশ্চিম কোচবিহার ৮৬, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৮৮, দক্ষিণ দিনাজপুর ৫৭ জন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক রচনায় জঙ্গিপুর থেকে দার্জিলিং এবং সিকিম নিয়ে উত্তরবঙ্গ প্রদেশ। প্রদেশ, বিভাগ (একাধিক জেলা) ও জেলার কার্যকর্তারা এই বর্গে শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ দেন। যাওয়া-আসা বাদে সাতদিন পুরো সময় প্রশিক্ষণ চলে। বর্গে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বয়ংসেবকরা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সঙ্ঘের দৈনন্দিন শাখার কাজ বৃদ্ধি করবেন। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও সিকিমের বর্গ জানুয়ারি মাসে হবে।

# শোকসংবাদ

বীরভূম জেলার মল্লারপুর গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষক তথা ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডলের পিতৃদেব অনাদিপ্রসাদ মণ্ডল (রতিকান্ত মাস্টার) গত ১৫ অক্টোবর ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি চার ছেলে, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

গত ৯ অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জ্যোতিষ শতপথী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষা বিভাগে পদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

গত ২৫ অক্টোবর সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার সদস্য তথা বিশিষ্ট অভিনেতা শ্যামল শঙ্কর নন্দী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। সদা হাস্যমুখ শ্রীনন্দী বিগত দুই বছর ধরে দুরারোগ্য স্মৃতিভ্রষ্টতায় ভুগছিলেন। তিনি সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছিল সহজাত। বহু নাটকে ও কিছু টিভি সিরিয়ালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ, এক কন্যা, জামাতা এবং নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ অনুরাগী রেখে গেছেন।


জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ

সাপ্তাহিক

**স্বস্তিকা**

পড়ুন ও পড়ান

# অসহিষ্ণুতা বাড়ছে না, এ নিয়ে ভণ্ডামি করার কিছু নেই

**হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন পূর্বতন রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ এক্সেলেন্স-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ও বর্তমান নীতি আয়োগ সদস্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেকদেব রায়। এদেশে তথাকথিত অসহিষ্ণুতার পরিবেশ নিয়ে তাঁর মতামত ও অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন। সম্প্রতি বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যারা আজ 'অসহিষ্ণুতার কথা বলছেন, তারা নিজেরাই চরম অসহিষ্ণু। সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।**

**□ দেশে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ নিয়ে খুব বিতর্ক চলছে। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা?**

□ এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতীকে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সে অধ্যাপনার সময় তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল। ভারতে টিকতে না পেরে বাধ্য হয়ে তিনি বিদেশে চলে যান। ভগবতী জানান দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ এমন একটা নির্দিষ্ট মতামতের প্রাধান্য ও পরিবেশ ছিল তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সেখানে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ত।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন এর পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। অর্থনীতিবিদ ড. বি আর সেনয় এই কমিটির বিরোধিতা করেন। তিনি একাই বিরোধী ছিলেন। আপনারা কখনও কেন্দ্রীয় কোনো নীতি নির্ধারক সংস্থায় এনার নাম দেখেছেন কি? নিশ্চয়ই দেখেননি। তাঁকে সম্পূর্ণ একঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল এই সুপণ্ডিত মানুষটি ভারতে কোনো চাকরি জোটাতে না পেরে শ্রীলঙ্কায় চলে যান।

এছাড়া তৃতীয় আর একটি উদাহরণ দেবো। Alexander Cambell নামে তৎকালীন এক প্রবীণ সাংবাদিক 'Heart of India' নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে তদানীন্তন সরকারের প্রশংসাই ছিল। সেইসঙ্গে জওহরলাল নেহরু, সমাজবাদ, যোজনা কমিশন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু হালকা (frivolous) কথাবার্তাও ছিল। বইটি ভারতে আজও নিষিদ্ধ। আজকাল যাঁরা বলেন নিষিদ্ধ করা অন্যায় তাঁরা কি কখনও এই বইটির অর্থাৎ 'হার্ট অফ ইন্ডিয়া'-র নাম করেন?

আমি তিনটি উদাহরণ দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইলাম 'অসহিষ্ণুতা' চিরকাল ছিল। আমরা যদি তাকে স্বীকার না করি সেটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

**□ আপনি তো শিক্ষা জগতের মানুষ। আপনি কি নিজের জীবনে সেখানে কখনও অসহিষ্ণুতার শিকার হয়েছিলেন?**

□ বলা দরকার, আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম। সত্যি কথা বলতে আমার জীবনের প্রথম চাকরি সেখানকার সেন্টার ফর রিসার্চ-এই ছিল। কিন্তু এরপর পাকা চাকরির জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমার নিজের অর্থনীতি বিভাগেই আবেদন করা মনস্থ করেছিলাম। অর্থনীতির তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান দীপক ব্যানার্জী আমাকে নিরস্ত করে বলেছিলেন,

''ভুলে যাও, এখানে তোমার চাকরি হবে না।'' মনে রাখবেন বাংলায় তখন বাম আমল। সমস্ত বিশারদরা ছিলেন বাম মনোভাবাপন্ন। আমাকে পুনায় চলে যেতে হলো।

**□ আচ্ছা, যে রাজীব গান্ধী ইনস্টিউটের আপনি একসময়ের অধিকর্তা ছিলেন সেখানে এই বিতর্কিত অসহিষ্ণুতার ওপর কোনো কনফারেন্স হলে কীভাবে পরিচালনা করতেন?**

□ হ্যাঁ, ওখানে ৮ বছর ছিলাম আর ওই সময়টার খুব সচেতনভাবে আমরা কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতাম।

মনে পড়ে ২০০২ সালে আমি একবার ভারতের কীরকম হওয়া উচিত, এখানের সমাজের চরিত্র কী ধরনের হওয়ার কথা, সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতের কেমন রূপ কল্পনা (Idea of India) করা যেতে পারে— এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটি আলোচনাসভা ডাকা মনস্থ করি। এই প্রসঙ্গে আমি 'অরগানাইজার পত্রিকার' তদানীন্তন সম্পাদক শ্রী শেষাদ্রী চারীকেও আমন্ত্রণ জানাই। বামপন্থী অনেক বক্তাও যোগ দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ওই আলোচনাসভার দিনেই সকালের কাগজের প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন বেরোল 'Congress think tank invites editor of organiser'। এর পরেই ১০নং জনপথ থেকে আমার কাছে একটি ফোন আসে। জনৈক ব্যক্তি বলেন, ''ম্যাডাম আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন। আপনি শেষাদ্রী চারীর আমন্ত্রণপত্রটি প্রত্যাহার করে নিন''। আমি বললাম, ''দেখুন, আমি তো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, এখন ম্যাডাম যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে তাঁকেই কথা বলতে বলুন।''

মিনিট দশেক পরে আবার ফোন এল। এবার বলা হলো— ''আপনি কি শেষাদ্রী চারীকে অনুরোধ করবেন যাতে তিনি বক্তব্যে কী কী বলবেন তার একটা আগাম লিখিত কপি যাতে জমা দেন''?

আমি বলেছিলাম, ''না আমি তা করতে পারবো না।'' বলা হলো— ''মানে ম্যাডাম এটা দেখতে চান''।

এরপরও আবার ফোন করে বলা হলো— শেষাদ্রী যদি বক্তৃতা করতে করতে গোধরা প্রসঙ্গেও ঢুকে পড়েন সেক্ষেত্রে কী হবে? ব্যাপারটা এর মধ্যে এমন চাউর হয়ে শোরগোল ফেলল। বহু কংগ্রেস নেতা শেষাদ্রী চারীকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে আর এলেনই না। আমি সম্মেলনটি করেছিলাম।

আবার বলি, ২০০৪ সালে আমি ও সহযোগী লবীশ ভাণ্ডারী 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের অবস্থা কিরকম' এই শিরোনামে একটি গবেষণা চালাই। এবং এই সূত্রে বিভিন্ন রাজ্যের রেটিংও করা হয়েছিল। সমীক্ষায় গুজরাট প্রথম হয়েছিল। এরপর ২০০৫ সালে গুজরাট পুরসভার নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় বেরোল--- কংগ্রেসের চিন্তাবিদ মোদীর গুজরাটকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। ব্যস, আর যায় কোথায়! আমি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডাম গান্ধীর কাছ থেকে একটি নোট পেলাম যাতে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে আমাদের সংস্থার পক্ষে কিছু প্রকাশ করার আগে তা যেন রাজনৈতিক সম্মতির জন্য অবশ্যই তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়। আমার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি অসম্মতি জানিয়ে পদত্যাগ করেছিলাম।

প্রসঙ্গত, সেই সময় অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশন কাজ করছিল। আমাকে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হলো। এর পরের দিন যোজনা কমিশনের যে দুটি Task force-এর আমি সদস্য ছিলাম আমাকে সেখান থেকেও পত্রপাঠ তাড়ানো হয়। তখন কি কেউ প্রতিবাদ করেছিল? আজকে যারা ভিন্ন মতের সহাবস্থান দরকার--- ভিন্ন দৃষ্টিকোণ জরুরি বলে হাঁক ছাড়াছেন, তাঁরা কেউই টুঁ শব্দ করেননি। দেশের বৌদ্ধিক পরিসরটি (intellectual discourse) এক ধরনের ব্যক্তিদের কব্জায় রয়েছে যাদের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ রয়েছে।

সহজ করে বললে এটি একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) ভোগ করা। সকলেই জানেন একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারীরা কখনই বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় না আর একচ্ছত্র দাপট বেঁচে থাকে সমমনস্কদের মধ্যে আদান প্রদান বা নেটওয়ার্ক-এর ভিত্তিতে।

**□ এক শ্রেণীর বিদ্বজ্জন ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার কথা বলছেন। আপনার কি মনে হয় তাঁদের কথায় সারবত্তা আছে না তাঁরা রাজনৈতিকভাবে কোনো পক্ষ অবলম্বন করে আছেন?**

□ সত্যি বললে বলতে হবে, এসব চুটকি কথাবার্তা আর পুরোপুরি সাবজেক্টিভ পারসেপশান অর্থাৎ মনগড়া উপলব্ধি। এই নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক চালানোর কোনো মানেই হয়না। কেননা আপনি বলতেই থাকবেন অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। আর আমি অবশ্যই বলব এর বাস্তবগ্রাহ্য প্রমাণ নেই যে এটা বাড়ছে। হ্যাঁ, আমি তখনই কেবল প্রমাণ করতে পারব যখন আমার হাতে পরিমাণগত কিছু লক্ষণ (Quantitative indicator) থাকবে। আর এই বিষয়ে নজর দিলেই প্রথমেই আসবে নিরপেক্ষ বিচারের মানদণ্ড Objective indicator। আর সেই মানদণ্ডে সাম্প্রদায়িক হিংসার বৃদ্ধি, ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা কোনো কিছুতেই তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই আমি অবশ্যই বলব অসহিষ্ণুতা বাড়ছে না। বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে অসহিষ্ণুতা বরাবর ছিল। এ নিয়ে ভণ্ডামি করার কোনো জায়গা নেই।


জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
**স্বস্তিকা**
পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০ টাকা

# 100 लगाओ, पुलिस बुलाओ

1DIAL

## मदद तुरन्त

**किसी भी आपदा या विपत्ति में पुलिस सहायता के लिए करें डायल 100**

- प्रदेश भर में कम्प्यूटर, जीपीएस, वायरलेस, पी.ए. सिस्टम आदि से लैस 1000 वाहन तैनात।
- 24 घण्टे सेवा उपलब्ध।
- आधुनिकतम तकनीक से लैस कंट्रोल रूम।

**100 लगाओ पुलिस बुलाओ**

प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रारंभ हो रही **डायल-100** सेवा नागरिकों की सुरक्षा में एक उपयोगी कदम साबित होगी।

**शिवराज सिंह चौहान**
मुख्यमंत्री

**1 नवंबर, 2015**

**से सेवा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रीवा में प्रारंभ**
**शेष सभी जिलों में भी शीघ्र ही सेवा शुरू होगी.**

देश भक्ति - जनसेवा मध्यप्रदेश पुलिस

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2015

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

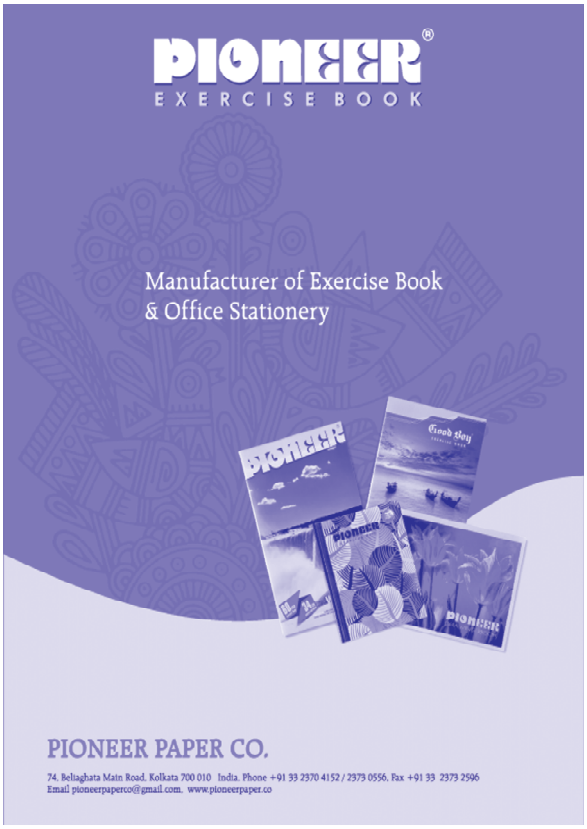



*'সেই মহা দেশমাতৃকার আনন্দোজ্জ্বল রূপ পুনরুদ্ভাসিত করতে হলে, প্রথমেই তাঁর শক্তিময়ী কন্যাগণ— যারা ভবিষ্যৎ উত্তরসাধিকা— তাদেরই সর্বাগ্রে মাকে কেন্দ্র করে দলে দলে সমবেত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গর্বোন্নত মস্তক নত করে, মায়ের পাদস্পর্শ করে তাদের অবশ্যই নিজেদের তথা স্বামী-পুত্রের জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই ভারতজননী বিজয় মুকুটে ভূষিতা হয়ে সমুন্নত শিরে বিশ্বসভায় দণ্ডায়মান হবেন!'*

*— ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
16 November - 2015 - Rs. 10.00






দাম : ১০.০০ টাকা